مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗ
اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١١﴾ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ
بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُوْلُ
الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ
نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ
بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾
يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَ
تَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ
غَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾
اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ
مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ
عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿١٦﴾ اِعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٧﴾

(১১) কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ধার দিবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার। (১২) যেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে, তাদের সম্মুখ ভাগে ও ডানপার্শ্বে তাদের জ্যোতি ছুটোছুটি করবে। বলা হবে : আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ জান্নাতের, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য। (১৩) যেদিন কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারীরা মুমিনদেরকে বলবে : তোমরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা কর, আমরাও কিছু আলো নিব তোমাদের জ্যোতি থেকে। বলা হবে : তোমরা পিছনে ফিরে যাও ও আলোর খোঁজ কর। অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব। (১৪) তারা মুমিনদেরকে ডেকে বলবে : আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে : হাঁ কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছ, অবশেষে আল্লাহ্‌র আদেশ পৌঁছেছে। এই সবই তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে। (১৫) অতএব, আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং কাফেরদের কাছ থেকেও নয়। তোমাদের সবার আবাসস্থল জাহান্নাম। সেটাই তোমাদের সঙ্গী। কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন স্থল। (১৬) যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (১৭) তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ই ভূ-ভাগকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। আমি পরিষ্কারভাবে তোমাদের জন্যে আয়াতগুলো ব্যক্ত করেছি, যাতে তোমরা বোঝ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ

অর্থাৎ, সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের অগ্রে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে।

'সেদিন' বলে কেয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। নূর দেয়ার ব্যাপারটি পুলসিরাতে চলার কিছু পূর্বে ঘটবে। হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এর বিবরণ রয়েছে। হাদীসটি কিছু দীর্ঘ। এতে আছে যে, আবু উমামা (রাঃ) একদিন দামেশ্‌কে এক জানাযায় শরীক হন। জানাযা শেষে উপস্থিত লোকদেরকে মৃত্যু ও পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে তিনি মৃত্যু, কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন। নিম্নে তাঁর কয়েকটি বাক্যের অনুবাদ দেয়া হল ঃ

অতঃপর তোমরা কবর থেকে হাশরের ময়দানে স্থানান্তরিত হবে। হাশরের বিভিন্ন মনযিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মনযিলে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে কিছু মুখমণ্ডলকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেয়া হবে এবং কিছু মুখমণ্ডলকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করে দেয়া হবে। অপর এক মনযিলে সমবেত সব মুমিন ও কাফেরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বণ্টন করা হবে। প্রত্যেক মুমিনকে নূর দেয়া হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মুমিনকে তার আমল পরিমাণে নূর দেয়া হবে। ফলে কারও নূর পর্বতসম, কারও খর্জুর বৃক্ষসম এবং কারও মানবদেহসম হবে। সর্বাপেক্ষা কম নূর সেই ব্যক্তির হবে, যার কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নূর থাকবে; তাও আবার কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে। — (ইবনে-কাসীর)

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

—অর্থাৎ, মুমিনদের জন্যে কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র যিকর এবং যে সত্য নাযিল করা হয়েছে তৎপ্রতি নম্র ও বিগলিত হবে?

خشوع قلب — এর অর্থ অন্তর নরম হওয়া, উপদেশ কবুল করা ও আনুগত্য করা। —(ইবনে-কাসীর) কোরআনের প্রতি অন্তর বিগলিত হওয়ার অর্থ এর বিধান তথা আদেশ ও নিষেধ পুরোপুরি পালনকরার জন্যে প্রস্তুত হওয়া এবং এ ব্যাপারে কোন অলসতা বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দেয়া।—(রুহুল-মা'আনী)

এটা মুমিনদের জন্যে হুশিয়ারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তাআলা কোন কোন মুমিনদের অন্তরে আমলের প্রতি অলসতা ও অনাসক্তি আঁচ করে এই আয়াত নাযিল করেন। (ইবনে-কাসীর) ইমাম আ'মাশ বলেন ঃ মদীনায় পৌঁছার পর কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হওয়ায় কোন কোন সাহাবীর কর্মোদ্দীপনায় কিছুটা শৈথিল্য দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। —(রুহুল-মা'আনী)।

হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) উপরোক্ত রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে, এই হুশিয়ারী সংকেত কোরআন অবতরণ শুরু হওয়ার তের বছর পরে নাযিল হয়। সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মসউদ

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ
لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾ اعْلَمُوا أَنَّمَا
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ
فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۙ وَمَغْفِرَةٌ
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾
سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ
الْأَرْضِ ۙ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ
ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا
آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

(১৮) নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহ্‌কে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। (১৯) আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে সিদ্দীক ও শহীদ বলে বিবেচিত। তাদের জন্যে রয়েছে পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কাফের ও আমার নিদর্শন অস্বীকারকারী তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। (২০) তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়। (২১) তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদের জন্যে। এটা আল্লাহ্‌র কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আল্লাহ্ মহান কৃপার অধিকারী। (২২) পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। (২৩) এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে উল্লসিত না হও। আল্লাহ্ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না, (২৪) যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

(রাঃ) বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে হুশিয়ার করা হয়।

মোটকথা, এই হুশিয়ারীর সারমর্ম হচ্ছে মুসলমানদেরকে পুরোপুরি নম্রতা ও সৎ কর্মের জন্যে তৎপর থাকার শিক্ষা দেয়া এবং একথা ব্যক্ত যে, আন্তরিক নম্রতাই সৎকর্মের ভিত্তি।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষের অন্তর থেকে সর্বপ্রথম নম্রতা উঠিয়ে নেয়া হবে। — (ইবনে-কাসীর)

আনুষঙ্গি জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রত্যেক মুমিনই কি সিদ্দীক ও শহীদ? وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায়। এই আয়াতের ভিত্তিতে হযরত কাতাদাহ্ ও আমর ইবনে মায়মুন (রাঃ) বলেন, যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই সিদ্দিক ও শহীদ।

হযরত বারা ইবনে আযেবের বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ مؤمنوا امتى شهداء অর্থাৎ আমার উম্মতের সব মুমিন শহীদ। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। — (ইবনে-জরীর)

একদিন হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) কাছে কিছুসংখ্যক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন ঃ كلكم صديق وشهيد অর্থাৎ, আপনারা প্রত্যেকেই সিদ্দীক ও শহীদ। সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন ঃ আবু হুরায়রা, আপনি এ কি বলছেন? তিনি জওয়াবে বললেনঃ আমার কথা বিশ্বাস না করলে কোরআনের এই আয়াত পাঠ করুন

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ

কিন্তু কোরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মুমিন সিদ্দীক ও শহীদ নয়; বরং মুমিনদের একটি উচ্চ শ্রেণীকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা হয়। আয়াতটি এই ঃ

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

এই আয়াতে পয়গম্বরগণের সাথে মুমিনদের তিনটি শ্রেণী বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে যথা, সিদ্দীক, শহীদ ও ছালেহ্। বাহ্যতঃ এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। নতুবা ভিন্ন ভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন ঃ সিদ্দীক ও শহীদ প্রকৃতপক্ষে মুমিনদের বিশেষ উচ্চশ্রেণীর লোকগণকে বলা হয়, যারা মহান গুণগরিমার অধিকারী। তবে আলোচ্য আয়াতে সব মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মুমিনকেও কোন না কোন দিক দিয়ে সিদ্দীক ও শহীদ বলে গণ্য এবং তাঁদের কাতারভুক্ত মনে করা হবে।

রুহুল-মা'আনীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে কামেল ও এবাদতকারী মুমিন অর্থ নেওয়া সঙ্গত। নতুবা যেসব মুমিন অসাবধান ও খেয়ালখুশীতে মগ্ন তাদেরকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায় না। এক হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন اللعانون لايكونون شهداء অর্থাৎ, যারা মানুষের প্রতি অভিসম্পাত করে তারা শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একবার উপস্থিত জনতাকে বললেন ঃ

তোমাদের কি হল যে, তোমরা কাউকে অপরের ইয্যতের উপর হামলা করতে দেখেও তাকে বাধা দাও না এবং একে খারাপ মনে কর না? জনতা আরয করল ঃ আমরা কিছু বললে সে আমাদের ইয্যতের উপরও হামলা চালাবে এই ভয়ে আমরা কিছু বলি না। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ যারা এমন শিথিল, তারা সেই শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যারা কেয়ামতের দিন পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উম্মতদের মোকাবেলায় সাক্ষ্য দিবে। — (রুহুল-মা'আনী)

তফসীরে-মাযহারীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে যারা ঈমানদার হয়েছে এবং তাঁর পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছে, তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। আয়াতে هُمُ الصِّدِّيقُونَ বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, একমাত্র সাহাবায়ে-কেরামই সিদ্দীক, অন্য কোন মুমিন নয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) বলেন ঃ সাহাবায়ে-কেরাম সকলেই পয়গম্বরসুলভ গুণগরিমার বাহক ছিলেন। যে ব্যক্তি একবার মুমিন অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেখেছে, সেই পয়গম্বরসুলভ গুণগরিমায় আপ্লুত হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পরকালীন চিরস্থায়ী অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। মানুষের পরকালের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং আযাবে ধৃত হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সুখ ও তাতে নিমগ্ন হয়ে পরকাল থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া। তাই আলোচ্য আয়তসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার যোগ্য নয়।

পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, সংক্ষেপে বলতে গেলে পার্থিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এই ঃ প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, এরপর সাজ-সজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ।

لَعِبٌ শব্দের অর্থ এমন খেলা, যাতে মোটেই উপকার লক্ষ্য থাকে না; যেমন কচি শিশুদের অঙ্গ চালনা। لَهْوٌ এমন খেলাধুলা, যার আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন ও সময়ক্ষেপণ হলেও প্রসঙ্গক্রমে ব্যায়াম অথবা অন্য কোন উপকারও অর্জিত হয়ে যায়। যেমন—বড় বালকদের ফুটবল, লক্ষ্যভেদ অর্জন ইত্যাদি খেলা। হাদীসে লক্ষ্যভেদ অর্জন ও সাঁতার অনুশীলনকে উত্তম খেলা বলা হয়েছে। অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজন বিদিত। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ لَعِبٌ এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর لَهْوٌ শুরু হয়। এরপর সে অঙ্গসজ্জায় ব্যাপৃত হয় এবং শেষ বয়সে সমসাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

উল্লেখিত ধারাবাহিকতার প্রতিটি স্তরেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং একেই সর্বোত্তম জ্ঞান করে। কিন্তু যখন এক স্তর ডিঙিয়ে অন্য স্তরে গমন করে, তখন বিগত স্তরের দুর্বলতা ও অসারতা তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। বালক-বালিকারা খেলা-ধুলাকে জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ ও সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ধন মনে করে। কেউ কেউ তাদের খেলার সামগ্রী ছিনিয়ে নিলে তারা এত ব্যথা পায়, যেমন বয়স্কদের ধন-সম্পদ, বাড়ীঘর ছিনিয়ে নিলে তারা ব্যথা পায়। কিন্তু এই স্তর অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলে পর তারা বুঝতে পারে যে, যেসব বস্তুকে তারা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছিল, সেগুলো ছিল অসার ও অর্থহীন বস্তু। যৌবনে সাজ-সজ্জা ও পারস্পরিক অহমিকাই থাকে জীবনের লক্ষ্য। বার্ধক্যে ধনে ও জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কিন্তু যৌবনে যেমন শৈশবের কার্যকলাপ অসার মনে হয়েছিল, বার্ধক্যে পৌঁছেও তেমনি যৌবনের কার্যকলাপ অনর্থক মনে হতে থাকে। বার্ধক্য হচ্ছে জীবনের সর্বশেষ মনযিল। এ মনযিলে ধন ও জনের প্রাচুর্য এবং জাঁক-জমক ও পদের জন্যে গর্ব জীবনের মহান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কোরআন পাক বলে যে, এই অবস্থাও সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। এর পরবর্তী দুটি স্তর বরযখ ও কেয়ামতের চিন্তা কর। এগুলোই আসল। অতঃপর কোরআন পাক বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে ঃ

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا

غيث শব্দের অর্থ বৃষ্টি। كفار শব্দটি মুমিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর অপর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টি দ্বারা ফসল ও নানা রকম উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে যখন সবুজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোন কোন তফসীরবিদ كفار শব্দটিকে প্রচলিত অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফেররা আনন্দিত হয়। এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবুজ, শ্যামল ফসল দেখে কাফেররাই কেবল আনন্দিত হয় না, মুসলমানরাও হয়। জওয়াব এই যে, মুমিনের আনন্দ ও কাফেরের আনন্দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। মুমিন আনন্দিত হলে তার চিন্তাধারা আল্লাহ্ তাআলার দিকে থাকে। সে বিশ্বাস করে যে, এই সুন্দর ফসল আল্লাহ্র কুদরত ও রহমতের ফল। সে একেই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে না। তার আনন্দের সাথে পরকালের চিন্তাও সদাসর্বদা বিদ্যমান থাকে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধনরত্ন পেয়েও মুমিন কাফেরের ন্যায় আনন্দিত ও মত্ত হয় না। তাই আয়াতে 'কাফের আনন্দিত হয়' বলা হয়েছে।

এরপর এই দৃষ্টান্তের সারসংক্ষেপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল ও অন্যান্য উদ্ভিদ যখন সবুজ শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাত্রই বিশেষ করে কাফেররা খুবই আনন্দিত ও মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে তা শুষ্ক হতে থাকে। প্রথমে পীতবর্ণ হয়, এরপরে সম্পূর্ণ খড়-কুটায় পরিণত হয়। মানুষও তেমনি প্রথমে তরুতাজা ও সুন্দর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এরূপই কাটে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনা করার পর আবার আসল উদ্দেশ্য—পরকালের চিন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে পরকালের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ অর্থাৎ, পরকালে মানুষ এ দু'টি অবস্থার মধ্যে যে-কোন একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফেরদের অবস্থা অর্থাৎ, তাদের জন্যে কঠোর আযাব রয়েছে। অপরটি মুমিনদের অবস্থা; অর্থাৎ, তাদের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে।

এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ — অর্থাৎ, এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার পর একজন বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারে

যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল। এখানকার সম্পদ-প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদমুহূর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর পরকালের আযাব ও সওয়াব এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এরূপ হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে পরকালের চিন্তা বেশী করবে। পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

—অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর প্রস্থের সমান।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার এক অর্থ এই যে, জীবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্যের কোন ভরসা নেই ; অতএব, সৎকাজে শৈথিল্য ও টালবাহানা করো না। এরূপ করলে কোন রোগ অথবা ওযর তোমার সৎকাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে কিংবা তোমার মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে। অতএব এর সারমর্ম এই যে, অক্ষমতা ও মৃত্যু আসার আগেই তুমি সৎকাজের পুঁজি সংগ্রহ করে নাও, যাতে জান্নাতে পৌছতে পার।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সৎকাজে অপরের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর উপদেশাবলীতে বলেন ঃ তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম গমণকারী এবং সর্বশেষ নির্গমনকারী হও। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ বলেন ঃ জেহাদে সর্বপ্রথম কাতারে থাকার জন্যে অগ্রসর হও। হযরত আনাস বলেন ঃ জামাতের নামাযের প্রথম তকবীরে উপস্থিত থাকার চেষ্টা কর। —(রুহুল-মা'আনী)

জান্নাতের পরিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ এর প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সূরা আল-এমরানে এই বিষয়বস্তুর আয়াতে سموات বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি একত্রিত করলে জান্নাতের প্রস্থ হবে। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা বেশী হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের বিস্তৃতি সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির চাইতে বেশী عرض শব্দটি কোন সময় কেবল বিস্তৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে না। উভয় অবস্থাতেই জান্নাতের বিশাল বিস্তৃতিই বোঝা যায়।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ পূর্বের আয়াতে জান্নাত ও তার নেয়ামতসমূহের দিকে অগ্রণী হওয়ার আদেশ ছিল। এতে কেউ ধারণা করতে পারত যে, জান্নাত ও তার অক্ষয় নেয়ামতরাজি মানুষের কর্মের ফল এবং মানুষের কর্মই এর জন্যে যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেছেন যে, তোমাদের ক্রিয়াকর্ম জান্নাত লাভের পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয় যে, ক্রিয়াকর্মের ফলেই জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব নেয়ামত লাভ করেছে, তার সারাজীবনের সৎকর্ম এগুলোর বিনিময়ও হতে পারে না, জান্নাতের অক্ষয় নেয়ামতরাজির মূল্য তো হওয়া দূরের কথা। অতএব আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপার বদৌলতেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসলিম ও বোখারী বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেন ঃ আপনিও কি তদ্রূপ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমিও আমার আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করতে পারি না— আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও অনুকম্পা হলেই লাভ করতে পারি। — (মাযহারী)

দু'টি পার্থিব বিষয় মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ ও পরকালের চিন্তা থেকে গাফেল করে দেয়। (এক) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, যাতে লিপ্ত হয়ে মানুষ আল্লাহ্কে ভুলে যায়। এ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। (দুই) বিপদাপদ, এতে জড়িত হয়েও মানুষ মাঝে মাঝে নিরাশ ও আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا —অর্থাৎ, পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ, লওহে-মাহ্ফূযে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। পৃথিবীর বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ —আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সুখ, আনন্দ অথবা দুঃখের সম্মুখীন হয়, তা সবই আল্লাহ্ তাআলা লওহে-মাহ্ফূযে মানুষের জন্মের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। এ বিষয়ের সংবাদ তোমাদেরকে এজন্যে দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার ভাল-মন্দ অবস্থা নিয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা না কর। দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদাপদ তেমন আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থসম্পদ তেমন উল্লাসিত ও মত্ত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশগুল হয়ে তোমরা আল্লাহ্র স্মরণ ও পরকাল সম্পর্কে গাফেল হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোন কোন বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোন কোন বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করে পরকালের পুরস্কার ও সওয়াব অর্জন করতে হবে এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও সওয়াব হাসিল করতে হবে। (রুহুল-মা'আনী)

পরবর্তী আয়াতে সুখ ও ধন-সম্পদের কারণে উদ্ধত্য ও অহংকারীদের নিন্দা করা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ —অর্থাৎ, আল্লাহ্র উদ্ধত্য অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার নেয়ামত পেয়ে যারা অহংকার করে, তারা আল্লাহ্র কাছে ঘৃণার্হ। কিন্তু পছন্দ করেন না, বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, বুদ্ধিমান ও পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হল প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্র পছন্দ ও অপছন্দের চিন্তা। তাই এখানে অপছন্দ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ
بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ
رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ
اِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ
وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا
بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا
عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ
فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ
كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ
عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ
يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

(২৫) আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২৬) আমি নূহ ও ইবরাহীমকে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং তাদের বংশধরের মধ্যে নবুওয়ত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি। অতঃপর তাদের কতক সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে এবং অধিকাংশই হয়েছে পাপাচারী। (২৭) অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছি আমার রসূলগণকে এবং তাদের অনুগামী করেছি মরিয়ম তনয় ঈসাকে ও তাকে দিয়েছি ইঞ্জীল। আমি তার অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন করেছি নম্রতা ও দয়া। আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর ফরয করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এটা অবলম্বন করেছে। অতঃপর তারা যথাযথভাবে তা পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দিয়েছি। আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (২৮) মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি নিজ অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দিবেন, তোমাদেরকে দিবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (২৯) যাতে কিতাবধারীরা জানে যে, আল্লাহ্‌র সামান্য অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন ক্ষমতা নেই, দয়া আল্লাহ্‌রই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ঐশী কিতাব ও পয়গম্বর প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা ঃ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ

بـيـنـات শব্দের আভিধানিক অর্থ সুস্পষ্ট বিষয়। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বিধানাবলীও হতে পারে; যেমন তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এর উদ্দেশ্য মোজেযা এবং রেসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও হতে পারে। —(ইবনে-কাসীর) পরবর্তী বাক্যে কিতাব নাযিলের আলাদা উল্লেখ বাহ্যতঃ শেষোক্ত তফসীরের সমর্থক। অর্থাৎ, بينات বলে মোজেযা ও প্রমাণাদি বোঝানো হয়েছে এবং বিধানাবলীর জন্যে কিতাব নাযিল করার কথা বলা হয়েছে।

কিতাবের সাথে 'মীযান' নাযিল করারও উল্লেখ আছে। মীযানের আসল অর্থ পরিমাপযন্ত্র। প্রচলিত দাঁড়িপাল্লা ছাড়া বিভিন্ন বস্তু ওজন করার জন্যে নবাবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও 'মীযান'-এর অর্থে শামিল আছে; যেমন আজকাল আলো, উত্তাপ ইত্যাদির পরিমাপযন্ত্র প্রচলিত আছে।

আয়াতে কিতাবের ন্যায় মীযানের বেলায়ও নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। কিতাব নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতার মাধ্যমে পয়গম্বরগণ পর্যন্ত পৌঁছা সুবিদিত। কিন্তু মীযান নাযিল করার অর্থ কি? এ সম্পর্কে তফসীরে রূহুল-মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদিতে বলা হয়েছে যে, মীযান নাযিল করার মানে দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানাবলী নাযিল করা। কুরতুবী বলেন ঃ প্রকৃতপক্ষে কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন ও আবিষ্কারকে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আরবদের বাকপদ্ধতিতে এর নজীর বিদ্যমান আছে। কাজেই আয়াতের অর্থ যেন এরূপ انزلنا الكتاب ووضعنا الميزان অর্থাৎ, আমি কিতাব নাযিল করেছি ও দাঁড়িপাল্লা উদ্ভাবন করেছি। সূরা আর-রহমানের وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে ميزان শব্দের সাথে وضع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, নূহ (আঃ)-এর প্রতি আক্ষরিক অর্থে আকাশ থেকে দাঁড়িপাল্লা নাযিল করা হয়েছিল এবং আদেশ করা হয়েছিল যে, এর সাহায্যেও ওজন করে দায়-দেনা পূর্ণ করতে হবে।

কিতাব ও মীযানের পর লৌহ নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নাযিল করার মানে সৃষ্টি করা। কোরআন পাকের এক আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায়ও নাযিল করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ চতুষ্পদ জন্তু আসমান থেকে নাযিল হয় না —পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। সেখানেও সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাযিল করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহুপূর্বেই লওহে-মাহ্ফূযে লিখিত ছিল—এ দিক দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ। —(রূহুল-মা'আনী)

আয়াতে লৌহ নাযিল করার দু'টি রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) এর ফলে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং এর সাহায্যে অবাধ্যদেরকে

খোদায়ী বিধান ও ন্যায়নীতি পালনে বাধ্য করা যায়। (দুই) এতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের জন্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকব্জা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোন শিল্প চলতে পারে না।

এখানে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ এবং ন্যায়নীতির দাঁড়িপাল্লা আবিষ্কার ও ব্যবহারের আসল লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ, মানুষ যাতে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর লৌহ সৃষ্টি করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্যও প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, পয়গম্বরগণও আসমানী কিতাবসমূহ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেন এবং যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে না, তাদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় দেখান। মীযান ইনসাফের সীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু যারা অবাধ্য ও হঠকারী, তারা কোন প্রমাণ মানে না এবং ন্যায়নীতি অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হয় না। তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হলে দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা সুদূরপরাহত। তাদেরকে বশে আনা লৌহ ও তরবারির কাজ, যা শাসকবর্গ অবশেষে বেগতিক হয়ে ব্যবহার করে।

এখানে আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, কোরআন পাক ইনসাফ ও সুবিচার দেনা-পাওনা পরিশোধ ও তাতে হ্রাসবৃদ্ধির নিষেধাজ্ঞা জানা যায় এবং মীযান দ্বারা অপরের দেনা-পাওনায় অংশ নির্ধারিত হয়। এই বস্তুদ্বয় নাযিল করার লক্ষ্যই হচ্ছে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এরপর শেষের দিকে লৌহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকল্পে লৌহের ব্যবহার বেগতিক অবস্থায় করতে হবে। এটা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার আসল উপায় নয়।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রকৃতপক্ষে চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। রাষ্ট্রের তরফ থেকে জোর-জবরদস্তি প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্যে নয়; বরং পথের বাধা দূর করার জন্যে বেগতিক অবস্থায় হয়ে থাকে। চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষা-দীক্ষাই আসল বিষয়।

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ রূহুল-মা'আনীতে আছে এখানে واو অব্যয়টি এই বাক্যকে একটি উহ্য বাক্যের সাথে সংযুক্ত করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ لينفعهم -আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, যাতে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয়, মানুষ এর দ্বারা শিল্পকাজে উপকৃত হয় এবং আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে আল্লাহ্ জেনে নেন কে লৌহের সমরাস্ত্র দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে ও ধর্মের জন্যে জিহাদ করে। আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু পূর্বেই জানেন। কিন্তু মানুষ কাজ করার পর তা আমলনামায় লিখিত হয়। এর মাধ্যমেই কাজটি আইনগত প্রকাশ লাভ করে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পার্থিব হেদায়েত ও পৃথিবীতে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে পয়গম্বর প্রেরণ এবং তাঁদের সাথে কিতাব ও মীযান অবতারণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাঁদের মধ্যথেকে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে দ্বিতীয় আদম হযরত নূহ (আঃ)-এর এবং পরে পয়গম্বরগণের শ্রদ্ধাভাজন ও মানবমণ্ডলীর ইমাম হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যত পয়গম্বর ও ঐশী কিতাব দুনিয়াতে আগমন করবে, তাঁরা সব এঁদেরই বংশধরের মধ্য থেকে হবে। অর্থাৎ, নূহ (আঃ)-এর সেই শাখাকে এই গৌরব অর্জনের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যাতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে যত পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন এবং যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা সব ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর।

এই বিশেষ আলোচনার পর পয়গম্বরগণের সমগ্র পরম্পরাকে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا অর্থাৎ, এরপর তাঁদের পশ্চাতে একের পর এক আমি আমার পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি। পরিশেষে বিশেষভাবে বনী-ইসরাঈলের সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আঃ)-এর উল্লেখ করে শেষনবী মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর শরীয়ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হাওয়ারীগণের বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً —অর্থাৎ, যারা হযরত ঈসা (আঃ) অথবা ইঞ্জীলের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের অন্তরে স্নেহ ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা একে অপরের প্রতি দয়া ও করুণাশীল কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি তারা অনুগ্রহশীল। رأفت ও رحمت শব্দদ্বয়কে সমঅর্থবোধক মনে করা হয়। এখানে ভিন্নমুখী করে উল্লেখ করায় কেউ কেউ বলেনঃ رأفة এর অর্থ অতি দয়া। সাধারণ দয়ার চাইতে এতে যেন আতিশয্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেনঃ কারও প্রতি দয়া করার দু'টি অভ্যাসগত কারণ থাকে। এক, সে কষ্টে পতিত থাকলে তার কষ্ট দূর করে দেয়া। একে رأفة বলা হয়। দুই, কোন বস্তুর প্রয়োজন থাকলে তাকে দান করা। একে رحمت বলা হয়। মোটকথা رأفة এর সম্পর্ক ক্ষতি দূর করার সাথে এবং رحمت এর সম্পর্ক উপকার অর্জনের সাথে। ক্ষতি দূর করাকে সবদিক দিয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তাই এই শব্দদ্বয় একত্রে ব্যবহৃত হলে رأفت কে অগ্রে আনা হয়।

এখানে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাহাবী তথা হাওয়ারীগণের দু'টি বিশেষ গুণ رأفت ও رحمت উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহাবায়ে-কেরামের কয়েকটি বিশেষ গুণ সূরা ফাত্হ-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ কিন্তু এর আগে সাহবায়ে-কেরামের আরও একটি বিশেষ গুণ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ও বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ, তাঁরা কাফেরদের প্রতি বজ্রকঠোর। পার্থক্যের কারণ এই যে, ঈসা (আঃ)-এর শরীয়তে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের বিধান ছিল না। তাই কাফেরদের বিপক্ষে কঠোরতা প্রকাশ করার কোন স্থানই সেখানে ছিল না।

সন্ন্যাসবাদের অর্থঃ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا - رهبانية শব্দটি رهبان - এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। رهبان ও راهب - এর অর্থ যে ভয় করে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর বনী-ইসরাঈলের মধ্যে পাপাচার ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে বিশেষতঃ রাজন্যবর্গ ও শাসকশ্রেণী ইঞ্জীলের বিধানাবলীর প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। বনী-ইসরাঈলের মধ্যে কিছুসংখ্যক খাঁটি আলেম ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা এই ধর্মবিমুখতাকে রুখে দাঁড়ালে তাঁদেরকে হত্যা করা হয়। যে কয়েকজন প্রাণে বেঁচে গেলেন তারা দেখলেন যে, মোকাবেলার শক্তি তাঁদের নেই;

কিন্তু এদের সাথে মিলে-মিশে থাকলে তাঁদের দ্বীন-ঈমান বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের জন্যে জরুরী করে নিলেন যে, তারা এখন থেকে বৈধ আরাম-আয়েশও বিসর্জন দিবেন, বিবাহ করবেন না, খাওয়া-পরা এবং ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করার চিন্তা করবেন না, বসবাসের জন্যে গৃহ নির্মাণে যত্নবান হবেন না, লোকালয় থেকে দূরে কোন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করবেন অথবা যাযাবরদের ন্যায় ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দিবেন যাতে ধর্মের বিধি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে পালন করা যায়। তারা আল্লাহ্‌র ভয়ে এই কর্ম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন; তাই তাঁরা راهب অথবা رهبان তথা সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হল এবং তাঁদের উদ্ভাবিত মতবাদ رهبانيت তথা সন্ন্যাসবাদ নামে খ্যাতি লাভ করেন।

তাদের এই মতবাদ পরিস্থিতির চাপে অপারক হয়ে নিজেদের ধর্মের হেফাযতের জন্যে ছিল। তাই এটা মূলতঃ নিন্দনীয় ছিল না। তবে কোন বিষয়কে আল্লাহ্‌র জন্যে নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নেয়ার পর তাতে ত্রুটি ও বিরুদ্ধাচরণ করা গুরুতর পাপ। উদাহরণতঃ মানত আসলে কারও উপর ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কোন ব্যক্তি নিজে কোন বস্তুকে মানত করতঃ নিজের উপর হারাম অথবা ওয়াজিব করে নিলে শরীয়তের আইনে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা গোনাহ্ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কতক লোক সন্ন্যাসবাদের নামের আড়ালে দুনিয়া উপার্জন ও ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। কেননা, জনসাধারণ তাদের ভক্ত হয়ে যায় এবং হাদিয়া ও নযর-নিয়ায আগমন করতে থাকে। তাদের চারপাশে নারী-পুরুষের ভিড় জমতে থাকে। ফলে বেহায়াপনাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাক এ বিষয়েই তাদের সমালোচনা করেছে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ভোগ বিলাস বিসর্জন দেয়া অপরিহার্য করে নিয়েছিল—আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফরয করা হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের উচিত ছিল এটা পালন করা, কিন্তু তারা তাও ঠিকমত পালন করতে পারেনি।

তাদের এই কর্মপন্থা মূলতঃ নিন্দনীয় ছিল না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)- এর হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে-কাসীর বর্ণিত এই হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ বনী-ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র তিনটি দল আযাব থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রথম দলটি হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর অত্যাচারী রাজন্যবর্গ ও ঐশ্বর্যশালী পাপাচারীদেরকে পূর্ণ শক্তি সহকারে রুখে দাঁড়ায়, সত্যের বাণী সর্বোচ্চে তুলে ধরে এবং ধর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়। কিন্তু অশুভ শক্তির মোকাবেলায় পরাজিত হয়ে তারা নিহত হয়। তাদের স্থলে অপর একদল দণ্ডায়মান হয়। তাদের মোকাবেলা করার এতটুকুও শক্তি ছিল না, কিন্তু তারা জীবনপণ করে মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেয়। পরিণামে তাদেরকেও হত্যা করা হয়। কতককে করাত দ্বারা চিরা হয় এবং কতককে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় বিপদাপদে সবর করে। এই দলটিও মুক্তি পেয়েছে, এরপর তৃতীয় দল তাদের জায়গায় আসে। তাদের মধ্যে মোকাবেলারও শক্তি ছিল না এবং পাপাচারীদের সাথে থেকে নিজেদের ধর্ম বরবাদ করারও তারা পক্ষপাতী ছিল না। তাই তারা জঙ্গল ও পাহাড়ের পথ বেছে নেয় এবং সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ আয়াতে তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যারা সন্ন্যাসবাদ অবলম্বন করে তা যথাযথভাবে পালন করেছে এবং বিপদাপদে সবর করেছে, তারাও মুক্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতের এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, যে ধরনের সন্ন্যাসবাদ প্রথমে তারা অবলম্বন করেছিল, তা নিন্দনীয় ও মন্দ ছিল না। তবে সেটা শরীয়তের বিধানও ছিল না। তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের উপর তা জরুরী করে নিয়েছিল। কিন্তু জরুরী করার পর কেউ কেউ একে যথাযথভাবে পালন করেনি। এখান থেকেই এর নিন্দনীয় ও মন্দ দিক শুরু হয়। যারা পালন করেনি, তাদের সংখ্যাই বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাই অধিকাংশের কাজকে সবার কাজ ধরে নিয়ে কোরআন গোটা বনী-ইসরাঈল সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, তারা যে সন্ন্যাসবাদকে নিজেদের উপর জরুরী করে নিয়েছিল, তা যথাযথ পালন করেনি

فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

এ থেকে আরও জানা গেল যে, ابتدعوا শব্দটি بدعت থেকে উদ্ভূত হলেও এস্থলে এর আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, উদ্ভাবন করা। এখানে পারিভাষিক বিদআত বোঝানো হয়নি, যে সম্পর্কে হাদীসে আছে كل بدعة ضلالة অর্থাৎ, প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা।

কোরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত ব্যাখ্যার সত্যতা ফুটে উঠে। সর্বপ্রথম এই বাক্যের প্রতিই লক্ষ্য করুন ঃ

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً

এখানে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় নেয়ামত প্রকাশ করার জায়গায় বলেছেনঃ আমি তাদের অন্তরে স্নেহ, দয়া ও সন্ন্যাসবাদ সৃষ্টি করেছি। এ থেকে বোঝা যায় যে, স্নেহ ও দয়া যেমন নিন্দনীয় নয়, তেমনি তাদের অবলম্বিত সন্ন্যাসবাদও সত্তাগতভাবে নিন্দনীয় ছিল না। নতুবা এ স্থলে একে স্নেহ ও দয়ার সাথে উল্লেখ করার কোন কারণ ছিল না। এ কারণেই যারা সন্ন্যাসবাদকে সর্বাবস্থায় দূষণীয় মনে করেন, তাদেরকে এ স্থলে বাক্যের সাথে رهبانية শব্দটির সংযুক্তির ব্যাপারে অনাবশ্যক ব্যাকরণিক হেরফেরের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তারা বলেন যে, এখানে رهبانية শব্দের আগে ابتدعوا বাক্যটি উহ্য আছে। ইমাম কুরতুবী তাই বলেছেন। কিন্তু উপরোক্ত তফসীর অনুযায়ী এই হেরফেরের কোন প্রয়োজন থাকে না। এরপরও কোরআন পাক তাদের এই উদ্ভাবনের কোনরূপ বিরূপ সমালোচনা করেনি; বরং সমালোচনা এ বিষয়ের কারণে করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের উদ্ভাবিত এই সন্ন্যাসবাদ যথাযথ পালন করেনি। এটাও ابتداع শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে নিলেই সম্ভবপর। পারিভাষিক অর্থে হলে কোরআন স্বয়ং এর বিরূপে সমালোচনা করত। কেননা, পারিভাষিক বিদআতও একটি পথভ্রষ্টতা।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর পূর্বোক্ত হাদীসেও সন্ন্যাসবাদ অবলম্বনকারী দলকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল গণ্য করা হয়েছে। তারা যদি পারিভাষিক বিদআতের অপরাধে অপরাধী হত, তবে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে নয়—পথভ্রষ্টদের মধ্যে গণ্য হত।

সন্ন্যাসবাদ সর্বাবস্থায়ই কি নিন্দনীয় ও অবৈধ ঃ বিশুদ্ধ কথা এই যে, رهبانية শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে, ভোগ-বিলাস বিসর্জন ও অবৈধ কাজ-কর্ম বর্জন। এর কয়েকটি স্তর আছে। (এক) কোন অনুমোদিত ও হালাল বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যতঃ হারাম সাব্যস্ত করা। এই অর্থে সন্ন্যাসবাদ নিশ্চিত হারাম। কারণ, এটা ধর্মের পরিবর্তন ও বিকৃতি।

কোরআন পাকের يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়েই নিষেধাজ্ঞা ও অবৈধতা বিধৃত হয়েছে। এই আয়াতে لَا تُحَرِّمُوا শব্দটিই ব্যক্ত করছে যে, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র হালালকৃত বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যতঃ হারাম সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পরিবর্তন ও বিকৃত করার নামান্তর।

(দুই) অনুমোদিত কাজকর্মকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যতঃ হারাম সাব্যস্ত করে না, কিন্তু কোন কোন পার্থিব কিংবা ধর্মীয় প্রয়োজনের খাতিরে অনুমোদিত কাজ বর্জন করে। পার্থিব প্রয়োজন যেমন কোন রোগব্যাধির আশংকা করে কোন অনুমোদিত বস্তু ভক্ষণে বিরত থাকা এবং ধর্মীয় প্রয়োজন—যেমন, পরিণামে কোন গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকায় কোন বৈধ কাজ বর্জন করা। উদাহরণতঃ মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি গোনাহ্‌ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেউ মানুষের সাথে মেলামেশাই বর্জন করে ; কিংবা কোন কুস্বভাবের প্রতিকারার্থে কিছুদিন পর্যন্ত কোন কোন বৈধ কাজ বর্জন করতঃ তা ততদিন অব্যাহত রাখা, যতদিন কুস্বভাব সম্পূর্ণ দূর না হয়ে যায়। সূফী বুযুর্গগণ মুরীদকে কম আহার, কম নিদ্রা ও কম মেলামেশার জোর আদেশ দেন। কারণ, এটা প্রবৃত্তি বশীভূত হয়ে গেলে এবং অবৈধতায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা দূর হয়ে গেলে এই সাধনা ত্যাগ করা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে সন্যাসবাদ নয় ; বরং তাকওয়া, যা ধর্মপরায়ণদের কাম্য এবং সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে প্রমাণিত।

(তিন) কোন অবৈধ বিষয়কে যেভাবে ব্যবহার করা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত আছে সেইরূপ ব্যবহার বর্জন করা এবং একেই সওয়াব ও উত্তম মনে করা। এটা এক প্রকার বাড়াবাড়ি, যা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)–এর অনেক হাদীসে নিষিদ্ধ। এক হাদীসে আছে لا رهبانية فى الاسلام অর্থাৎ, ইসলামে সন্ন্যাসবাদ নেই। এতে এই তৃতীয় স্তরের বর্জনই বোঝানো হয়েছে। বনী-ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে যে সন্যাসবাদের গোড়াপত্তন হয়, তা ধর্মের হেফাযতের প্রয়োজনে হলে দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ, তাকওয়ার মধ্যে দাখিল। কিন্তু কিতাবধারীদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি ছিল। এই বাড়াবাড়ির ফলে তারা প্রথম স্তর অর্থাৎ, হালালকে হারাম করা পর্যন্ত পৌঁছে থাকলে তারা হারাম কাজ করেছে। আর তৃতীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছে থাকলেও এক নিন্দনীয় কাজের অপরাধী হয়েছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ — এই আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)- এর প্রতি বিশ্বাসী কিতাবধারী মুমিনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে কেবল মুসলমানগণকে সম্বোধন করাই কোরআন পাকের সাধারণ রীতি। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বেলায় 'আহ্‌লে কিতাব' শব্দ ব্যবহার করা হয়। কেননা, রসূলুল্লাহ্‌ (আঃ)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)- এর প্রতি তাদের বিশ্বাস যথেষ্ট ও ধর্তব্য নয়। কাজেই তারা الَّذِينَ آمَنُوا কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এই সাধারণ রীতির বিপরীতে খ্রীষ্টানদের জন্য الَّذِينَ آمَنُوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবত ঃ এর রহস্য এই যে, পরবর্তী বাক্যে তাদেরকে রসূলুল্লাহ্‌ (আঃ)- এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, এটাই হযরত ঈসা (আঃ)–এর প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসের দাবী। তারা যদি তা করে, তবে তারা উপরোক্ত সম্বোধনের যোগ্য হয়ে যাবে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার ও সওয়াব দানের ওয়াদা করা হয়েছে। এক সওয়াব হযরত মূসা (আঃ) অথবা ঈসা (আঃ)- এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ও তাঁদের শরীয়ত পালন করার এবং দ্বিতীয় সওয়াব শেষনবী (সাঃ)–এর প্রতি ঈমান ও তাঁর শরীয়ত পালন করার এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত আছে যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)- এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত কাফের ছিল এবং কাফেরদের কোন এবাদত গ্রহণীয় নয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছিল যে, বিগত শরীয়তানুযায়ী তাদের সব কাজকর্ম নিষ্ফল হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, কাফের মুসলমান হয়ে গেলে তার কাফের অবস্থায় কৃত সব সৎকর্ম বহাল করে দেয়া হয়। ফলে সে দুই সওয়াবের অধিকারী হয়।

لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ এখানে لا অতিরিক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উল্লেখিত বিধানাবলী এজন্যে বর্ণনা করা হল, যাতে কিতাবধারীরা জেনে নেয় যে, তারা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে কেবল ঈসা (আঃ)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেই আল্লাহ্‌ তাআলার কৃপা লাভের যোগ্য নয়। যদি তারা নিজেদের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করে এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)–এর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে, তবেই তারা আল্লাহ্‌র কৃপালাভে সমর্থ হবে।

সূরা হাদীদ সমাপ্ত।

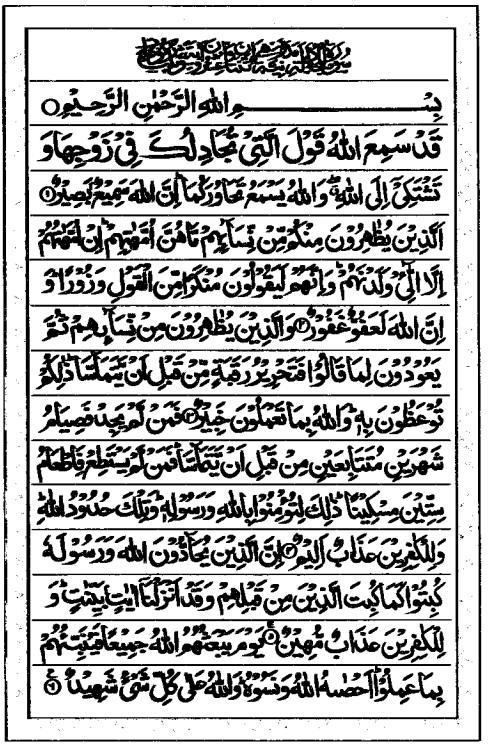

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَ
تَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿١﴾
اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ
اِلَّا الّٰٓـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ؕ وَ
اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ
يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ
تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ
سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؕ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ
وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ؕ وَ
لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ
بِمَا عَمِلُوْا ؕ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٦﴾

সূরা আল-মুজাদালাহ্
মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ২২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহ্‌র দরবারে, আল্লাহ্ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ্ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (২) তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (৩) যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফ্‌ফারা এই ঃ একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্যে উপদেশ হবে। আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর। (৪) যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাট জন মিসকীনকে আহার করাবে। এটা এজন্যে, যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতিবিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব (৫) যারা আল্লাহ্‌র তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা অপদস্থ হয়েছে, যেমন অপদস্থ হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীরা। আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (৬) সেদিন স্মরণীয় ; যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তারা করত। আল্লাহ্ তার হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত আছে সব বস্তুই।

সূরা আল-মুজাদালাহ্

শানে-নুযূল ঃ একটি বিশেষ ঘটনা এই সূরার প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত অবতরণের হেতু। হযরত আওস ইবনে সামেত (রাঃ) একবার তাঁর স্ত্রী খাওলাকে বলে দিলেন ঃ **انت على كظهر امى** অর্থাৎ, তুমি আমার পক্ষে আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের ন্যায়; মানে হারাম। ইসলাম-পূর্বকালে এই বাক্যটি স্ত্রীকে চিরতরে হারাম করার জন্যে বলা হত, যা ছিল চূড়ান্ত তালাক অপেক্ষাও কঠোরতর। এই ঘটনার পর হযরত খাওলা (রাঃ)-এর শরীয়তসম্মত বিধান জানার জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন পর্যন্ত এই বিষয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তাই তিনি পূর্ব থেকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী খাওলাকে বলে দিলেন ঃ **ما اراك الا قد حرمت عليه** অর্থাৎ, আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে গেছ। খাওলা একথা শুনে বিলাপ শুরু করে দিলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার যৌবন তার কাছে নিঃশেষ করেছি। এখন বার্ধক্যে সে আমার সাথে এই ব্যবহার করল। আমি কোথায় যাব। আমার ও আমার বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ কিরূপে হবে। এক রেওয়ায়েতে খাওলার এ উক্তিও বর্ণিত আছে ঃ **ماذكر طلاقا** অর্থাৎ, আমার স্বামী তো তালাক উচ্চারণ করেনি। এমতাবস্থায় তালাক কিরূপে হয়ে গেল ? অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, খাওলা আল্লাহ্ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করলেন ঃ **اللهم انى اشكو اليك** অর্থাৎ, আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে অভিযোগ করছি। এক রেওয়ায়েতে আছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খাওলাকে একথা বললেন ঃ **ما امرت فى شانك بشئ حتى الان** অর্থাৎ, তোমার মাসআলা সম্পর্কে আমার প্রতি এখন পর্যন্ত কোন বিধান অবতীর্ণ হয়নি (এসব রেওয়ায়েতে কোন বৈপরীত্য নেই। সবগুলোই সঠিক হতে পারে।) এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।—(দুররে-মনসুর, ইবনে-কাসীর)

ফেকাহ্‌র পরিভাষায় এই বিশেষ মাসালাটিকে 'যিহার' বলা হয়। এই সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহে যিহারের শরীয়তসম্মত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আল্লাহ্ তাআলা হযরত খাওলার (রাঃ) ফরিয়াদ শুনে তার জন্যে তার সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন। তার খাতিরে আল্লাহ্ তাআলা কোরআন পাকে এসব আয়াত নাযিল করেছেন। তাই সাহাবায়ে কেরাম এই মহিলার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। একদিন খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) একদল লোকের সাথে গমনরত ছিলেন। পতিমধ্যে এই মহিলা সামনে এসে দণ্ডায়মান হলে তিনি দাঁড়িয়ে তার কথাবার্তা শুনলেন। কেউ কেউ বলল ঃ আপনি এই বৃদ্ধার খাতিরে এতবড় দলকে পথে আটকিয়ে রাখলেন। খলীফা বললেন ঃ জান ইনি কে? এ সেই মহিলা, যার কথা আল্লাহ্ তাআলা সপ্ত আকাশের উপরে শুনেছেন। অতএব, আমি কি তাঁর কথা এড়িয়ে যেতে পারি? আল্লাহ্‌র কসম, তিনি যদি স্বেচ্ছায় প্রস্থান না করতেন, তবে আমি রাত্রি পর্যন্ত তার সাথে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতাম।—(ইবনে-কাসীর)

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ —পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এসব আয়াতে উল্লেখিত নারী হলেন হযরত আওস ইবনে সামেত (রাঃ)-এর স্ত্রী খাওলা বিনতে সা'লাবা। তাঁর স্বামী তাঁর সাথে যিহার করেছিলেন। তিনি এই অভিযোগ নিয়ে রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সম্মান দান করে জওয়াবে এসব আয়াত

নাযিল করলেন। আল্লাহ্ তাআলা এসব আয়াতে কেবল যিহারের শরীয়তসম্মত বিধান বর্ণনা এবং তাঁর কষ্ট দূর করার ব্যবস্থাই করেননি; বরং তাঁর মনোরঞ্জনের জন্যে শুরুতেই বলে দিলেন ঃ যে নারী তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল, আমি তার কথা শুনেছি। একবার জওয়াব দেয়া সত্ত্বেও মহিলা বার বার নিজের কষ্ট বর্ণনা করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আয়াতে একেই مجادلة বলা হয়েছে। কতক রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জওয়াবে খাওলাকে বললেন ঃ তোমার ব্যাপারে আমার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার কোন বিধান নাযিল হয়নি। তখন দুঃখিনীর মুখে একথা উচ্চারিত হল ঃ আপনার প্রতি তো প্রত্যেক ব্যাপারে বিধান নাযিল হয়। আমার ব্যাপারে কি হল যে, ওহীও বন্ধ হয়ে গেল।—(কুরতুবী) এরপর খাওলা আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করতে লাগলেন। এর প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাযিল হয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন ঃ সেই সত্তা পবিত্র, যিনি সব আওয়ায ও প্রত্যেকের ফরিয়াদ শুনেন; খাওলা বিনতে সালাবা যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমি তার কোন কোন কথা শুনতে পারিনি। অথচ আল্লাহ্ তাআলা সব শুনেছেন এবং বলেছেন ঃ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ (বোখারী, ইবনে-কাসীর)

ظهار শব্দটি يُظٰهِرُوْنَ - اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ থেকে উদ্ভূত। স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ার বিশেষ একটি পদ্ধতিকে ظهار বলা হয়। এটা ইসলাম-পূর্বকালে প্রচলিত ছিল। পদ্ধতিটি এই ঃ স্বামী স্ত্রীকে বলে দিবে— انت على كظهر امى অর্থাৎ, তুমি আমার উপর আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের মত হারাম। এখানে পেটই আসল উদ্দেশ্য, কিন্তু রূপকভঙ্গিতে পৃষ্ঠদেশের উল্লেখ করা হয়েছে।—(কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত এই প্রথার দ্বিবিধ সংস্কার সাধন করেছে। প্রথমতঃ স্বয়ং যিহারের প্রথাকেই অবৈধ ও গোনাহ্ সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ কাম্য হলে তার বৈধ পন্থা হচ্ছে তালাক। সেটা অবলম্বন করা দরকার। যিহারকে একাজের জন্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা স্ত্রীকে মাতা বলে দেয়া একটা অসার ও মিথ্যা বাক্য। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓئِيْ وَلَدْنَهُمْ অর্থাৎ, তাদের এই অসার উক্তির কারণে স্ত্রী মাতা হয়ে যায় না। মাতা তো সে-ই যার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে ঃ এরপর বলেছে ঃ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا অর্থাৎ, তাদের এই উক্তি মিথ্যা এবং পাপও। কারণ, বাস্তব ঘটনার বিপরীতে স্ত্রীকে মাতা বলছে।

দ্বিতীয় সংস্কার এই করেছে যে, যদি কোন মূর্খ অর্বাচীন ব্যক্তি এরূপ করেই বসে, তবে এই বাক্যের কারণে ইসলামী শরীয়তে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না। কিন্তু এই বাক্য বলার পর স্ত্রীকে পূর্ববৎ ভোগ করার অধিকারও তাকে দেয়া হবে না। বরং তাকে জরিমানাস্বরূপ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। সে যদি এই উক্তি প্রত্যাহার করতে চায় এবং পূর্বের ন্যায় স্ত্রীকে ব্যবহার করতে চায়, তবে কাফ্ফারা আদায় করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কাফ্ফারা আদায় না করলে স্ত্রী হালাল হবে না।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا আয়াতের অর্থ তাই। এখানে لِمَا قَالُوْا শব্দটি عما قالوا শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তারা আপন উক্তি প্রত্যাহার করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) يَعُوْدُوْنَ শব্দের অর্থ করেন يندمون অর্থাৎ একথা বলার পর তারা অনুতপ্ত হয় এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চায়। —(মাযহারী)

এই আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যেই কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে। খোদ যিহার কাফ্ফারার কারণ নয়। বরং যিহার করা এমন গোনাহ্, যার কাফ্ফারা হচ্ছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আয়াত শেষে وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই কোন ব্যক্তি যদি যিহার করার পর স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে না চায়, তবে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ন করা না জায়েয। স্ত্রী দাবী করলে কাফ্ফারা আদায় করে মেলামেশা করা অথবা তালাক দিয়ে মুক্ত করা ওয়াজিব। স্বামী স্বেচ্ছায় এরূপ না করলে স্ত্রী আদালতে রুজু হয়ে স্বামীকে এরূপ করতে বাধ্য করতে পারে।

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ –অর্থাৎ, যিহারের কাফ্ফারা এই যে, একজন দাস অথবা দাসীকে মুক্ত করবে। এরূপ করতে সক্ষম না হলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। রোগ-ব্যাধি কিংবা দুর্বলতাবশতঃ এতওলো রোযা রাখতেও সক্ষম না হলে ষাট জন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে আহার করাবে। আহার করানোর পরিবর্তে ষাট জন মিসকীনকে জনপ্রতি একজনের ফেৎরা পরিমাণ গম কিংবা তার মূল্য দিলেও চলবে। আমাদের প্রচলিত ওজনে একজনের ফেৎরার পরিমাণ হচ্ছে পৌনে দু'সের গম।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ –এই আয়াতে ঈমান বলে শরীয়ত ও বিধানাবলী পালন বোঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ কাফ্ফারা ইত্যাদির বিধান আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। এই সীমা ডিঙানো হারাম। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইসলাম বিবাহ, তালাক, যিহার ও অন্যান্য সব ব্যাপারে মূর্খতা যুগের প্রথা-পদ্ধতি বিলোপ করে সুষম ও বিশুদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা এগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। যারা এসব সীমা মানে না তথা কাফের, তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ –পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্র সীমা ও ইসলামের বিধানাবলী পালন করার তাকীদ ছিল। এই আয়াতে বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রতি শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এতে পার্থিব লাঞ্ছনা ও উদ্দেশ্যে ব্যর্থতা এবং পরকালে কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ –এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, মানুষ দুনিয়াতে পাপাচার করে যায় এবং তা তার স্মরণও থাকে না। স্মরণ না থাকার কারণ হচ্ছে একে মোটেই গুরুত্ব না দেয়া। কিন্তু তার সব পাপাচার আল্লাহ্র কাছে লিখিত আছে। আল্লাহ্ তাআলার সব স্মরণ আছে। এজন্যে আযাব হবে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن
نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ
مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ
النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ۖ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ
وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۖ
يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ
فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا
بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ
مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ
لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

(৭) আপনি কি ভেবে দেখেননি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ্ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন, তারা যা করে, তিনি কেয়ামতের দিন তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (৮) আপনি কি ভেবে দেখেননি, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, সীমালংঘন এবং রসূলের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাঘুষা করে। তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম করে, যদ্দ্বারা আল্লাহ্ আপনাকে সালাম করেননি। তারা মনে মনে বলে ঃ আমরা যা বলি, তজ্জন্যে আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের জন্যে যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। কতই না নিকৃষ্ট সেই জায়গা! (৯) মুমিনগণ, তোমরা যখন কানাকানি কর, তখন পাপাচার, সীমালংঘন ও রসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না বরং অনুগ্রহ ও খোদাভীতির ব্যাপারে কানাকানি করো। আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর কাছে তোমরা একত্রিত হবে। (১০) এই কানাঘুষা তো শয়তানের কাজ ; মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্যে। তবে আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মুমিনদের উচিত আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। (১১) মুমিনগণ, যখন তোমাদেরকে বলা হয় ঃ মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে প্রশস্ত করে দিবেন। যখন বলা হয় ঃ উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ্ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নুযূল ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ কয়েকটি ঘটনা। (এক) ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তিচুক্তি ছিল। কিন্তু ইহুদীরা যখন কোন মুসলমানকে দেখত, তখন তার চিন্তাধারাকে বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশে পরস্পরে কানাকানি শুরু করে দিত। মুসলমান ব্যক্তি মনে করত যে, তার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করা হচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইহুদীদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা বিরত হল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ..... আয়াতে অবতীর্ণ হয়।

(দুই) মুনাফিকরাও এমনিভাবে পরস্পরে কানাকানি করত। এর পরিপ্রেক্ষিতে إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا আয়াত নাযিল হল। (তিন) ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলে দুষ্টুমির ছলে السلام عليكم বলার পরিবর্তে السلام عليكم বলত। سام শব্দের অর্থ মৃত্যু। (চার) মুনাফিকরাও এমনিভাবে বলত। উভয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ ..... আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইবনে-কাসীর ইমাম আহমদ (রহঃ) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, ইহুদীরা এভাবে সালাম করে চুপিসারে বলত ঃ

لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ –অর্থাৎ, আমাদের এই গোনাহের কারণে আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? (পাঁচ) একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মসজিদে সুফ্ফায় অবস্থানরত ছিলেন। মসজিদে অনেক লোক সমাগম ছিল। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থান পেলেন না। মজলিসের লোকজনও চেপে চেপে বসে স্থান করে দিল না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই নির্বিকার দৃশ্য দেখে কয়েকজন লোককে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ দিলেন। মুনাফিকরা 'এটা কেমন ইনসাফ' বলে আপত্তি জানাল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বললেন ঃ আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন, যে আপন ভাইয়ের জন্যে জায়গা খালি করে দেয়। এরপর লোকেরা জায়গা খালি করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ ... আয়াত অবতীর্ণ হয়। —(ইবনে-কাসীর)

রেওয়ায়েতের সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রথমে জায়গা খালি করে দেয়ার কথা বলে থাকবেন। কেউ কেউ খালি করে দিল, যা পর্যাপ্ত ছিল না এবং কেউ কেউ খালি করল না। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে উঠে যেতে বলেছেন, যা মুনাফিকদের মনঃপুত হয়নি। (ছয়) কোন কোন বিত্তশালী লোক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কানকথা বলত। ফলে নিঃস্ব মুসলমানগণ কথাবার্তা বলে উপকৃত হওয়ার সময় কম পেত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছেও ধনীদের দীর্ঘক্ষণ বসে কানকথা অপছন্দনীয় ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ ... আয়াত অবতীর্ণ হয়। ফতহুল বয়ানে বর্ণিত আছে—ইহুদী ও মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে অনাবশ্যক কানকথা বলত। মুসলমানগণ কোন ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে কানকথা হচ্ছে ধারণা করে তা পছন্দ করত না। ফলে তাদেরকে নিষেধ করা হয়, যা نُهُوا عَنْهُ বাক্যে বিধৃত হয়েছে। কিন্তু যখন তারা বিরত হল না,তখন إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ আয়াত অবতীর্ণ হল। এর ফলশ্রুতিতে বাতিলপন্থীরা কানাকানি করা

থেকে বিরত হয়। কারণ, অর্থ প্রীতির কারণে সদকা প্রদান করা তাদের জন্যে কষ্টকর ছিল।

(সাত) যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করার আদেশ হল, তখন অনেকে জরুরী কথাও বন্ধ করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ..... أَأَشْفَقْتُمْ আয়াত নাযিল হল। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন : সদকা প্রদান করার আদেশে পূর্ব থেকেও فَإِن لَّمْ تَجِدُوا আয়াতে অসমর্থ লোকদের বেলায় আদেশ শিথিল করা হয়েছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক সম্পূর্ণ অসমর্থও ছিল না এবং পুরোপুরি বিত্তশালীও ছিল না। কম সামর্থ্য এবং অক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহের কারণে সম্ভবতঃ তাদের জন্যেই সদকা প্রদান করা কষ্টকর হয়েছিল। তাই তারা সদকা প্রদান করতে পারেনি এবং নিজেদেরকে আদেশের আওতা বহির্ভূতও মনে করেনি। আর কানকথা বলা এবাদতও ছিল না যে, এটা ত্যাগ করলে নিন্দার পাত্র হয়ে যাবে। তাই তার কানকথা বলা বন্ধ করেছিল। —(সবগুলো রেওয়ায়েতই দুররে-মনসূরে বর্ণিত আছে।) অবতরণের এসব হেতু জানার ফলে আয়াতসমূহের তফসীর বোঝা সহজ হবে।—(বয়ানুল-কোরআন)

* আলোচ্য আয়াতসমূহ শানে-নুযূলে বর্ণিত বিশেষ ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও কোরআনী নির্দেশসমূহ ব্যাপক হয়ে থাকে। এগুলোতে আকায়েদ, এবাদত, পারস্পরিক লেন-দেন ও সামাজিকতার যাবতীয় বিধি-বিধান বিদ্যমান থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও পারস্পরিক কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে এমনি ধরনের কতিপয় বিধান আছে।

গোপন পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ : গোপন পরামর্শ সাধারণতঃ বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে হয়ে থাকে, যাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তারা এই গোপন রহস্য কারও কাছে প্রকাশ করবে না। তাই এরূপ ক্ষেত্রে কারও প্রতি জুলুম করা, কাউকে হত্যা করা, কারও বিষয়-সম্পত্তি অধিকার করা ইত্যাদি বিষয়েরও পরিকল্পনা করা হয়। আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলেছেন যে, আল্লাহ্র জ্ঞান সমগ্র বিশ্বজগতকে পরিবেষ্টিত। তোমরা যেখানে যত আত্মগোপন করেই পরামর্শ কর, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জ্ঞান, শ্রবণ ও দৃষ্টির দিক দিয়ে তোমাদের কাছে থাকেন এবং তোমাদের প্রত্যেক কথা শুনেন, দেখেন ও জানেন। যদি তাতে কোন পাপ কাজ কর, তবে শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে না। এতে বলা উদ্দেশ্য তো এই যে, তোমরা যতই কম বা বেশী মানুষে পরামর্শ ও কানাকানি কর না কেন, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন। উদারহরণস্বরূপ তিন ও পাঁচের সংখ্যা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা তিন জনে পরামর্শ কর, তবে বোঝে নাও যে, চতুর্থজন আল্লাহ্ তাআলা সেখানে বিদ্যমান আছেন। আর যদি পাঁচ জনে পরামর্শ কর, তবে ষষ্ঠ জন আল্লাহ্ তাআলা বিদ্যমান আছেন। তিন ও পাঁচের সংখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত আছে যে, দলের জন্যে আল্লাহ্র কাছে বেজোড় সংখ্যা পছন্দনীয়।

مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ আয়াতের সারমর্ম তাই।

কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ —শানে নুযূলের ঘটনায় বলা হয়েছে, ইহুদী ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা চালাতে পারত না। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্তর্নিহিত জিঘাংসা চরিতার্থ করার এক পদ্ধতি তারা আবিষ্কার করেছিল। তা এই যে, তারা যখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে কাউকে কাছে আসতে দেখত, তখন পারস্পরিক কানাকানি ও গোপন পরামর্শের আকারে জটলা সৃষ্টি করত এবং আগন্তুক মুসলমানের দিকে কিছু ইশারা-ইঙ্গিত করত। ফলে আগন্তুক ধারণা করত যে, তার বিরুদ্ধেই কোন ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এতে সে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারত না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইহুদীদেরকে এরূপ কানাকানি করতে নিষেধ করে দেন। نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ বাক্যে এই নিষেধাজ্ঞাই বর্ণিত হয়েছে।

এই নিষেধাজ্ঞার ফলে মুসলমানদের জন্যেও আইন হয়ে যায় যে, তারাও পরস্পরে এমনভাবে কানা-কানি ও পরামর্শ করবে না, যদ্দ্বারা অন্য মুসলমান মানসিক কষ্ট পেতে পারে।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আবদুল্লাহ্ ইবনে-মসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন :

অর্থাৎ, যেখানে তোমরা তিন জন একত্রিত সেখানে দুই জন তৃতীয় জনকে ছেড়ে পরস্পরে কানাকানি ও গোপন কথাবার্তা বলবে না, যে পর্যন্ত আরও লোক না এসে যায়। কারণ, এতে সে মনঃক্ষুণ্ন হবে, সে নিজেকে পর বলে ভাববে এবং তার বিরুদ্ধেই কথাবার্তা হচ্ছে বলে সে সন্দেহ করবে।—(মাযহারী)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদেরকে অবৈধ কানাকানির কারণে হুসিয়ার করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা সব অবস্থা ও কথাবার্তা জানেন, তারা যেন তাদের কানাকানি ও পরামর্শের মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে। এই লক্ষ্য রাখার সাথে তারা যেন চেষ্টা করে যাতে তাদের পরামর্শ ও কানকথার মধ্যে পাপাচার, জুলুম অথবা শরীয়ত বিরুদ্ধ কোন প্রসঙ্গ না থাকে ; বরং সৎকাজের জন্যেই যেন তারা পরস্পরে পরামর্শ করে।

মজলিসের কতিপয় শিষ্টাচার : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا মুসলমানদের সাধারণ মজলিসসমূহের বিধান এই যে, কিছু লোক পরে আগমন করলে উপবিষ্টরা তাদের বসার জায়গা করে দিবে এবং চেপে চেপে বসবে। এরূপ করলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্যে প্রশস্ততা সৃষ্টি করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এই প্রশস্ততা পরকালে তো প্রকাশ্যই, সাংসারিক জীবিকায় এই প্রশস্ততা হলেও তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এই আয়াতে মজলিসের শিষ্টাচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় নির্দেশ এই : وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا —অর্থাৎ, যখন তোমাদের কাউকে মজলিস থেকে উঠে যেতে বলা হয়, তখন ওঠে যাও। আয়াতে কে বলবে, তার উল্লেখ নেই। তবে সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং আগন্তুক ব্যক্তি নিজের জন্যে জায়গা করার উদ্দেশে কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিলে তা জায়েয হবে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ
نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ۭ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ
صَدَقٰتٍ ۭ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ
اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۭ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا
مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا
شَدِيْدًا ۭ اِنَّهُمْ سَاۗءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً
فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ
اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ
كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰي شَيْءٍ ۭ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ
الْكٰذِبُوْنَ ۝ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰىهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ۭ
اُولٰۗىِٕكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ۭ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝
اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَاۗدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰۗىِٕكَ فِي الْاَذَلِّيْنَ ۝

(১২) মুমিনগণ, তোমরা রসূলের কাছে কানকথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদকা প্রদান করবে। এটা তোমাদের জন্যে শ্রেয়ঃ ও পবিত্র হওয়ার ভাল উপায়। যদি তাতে সক্ষম না হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৩) তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে? অতঃপর তোমরা যখন সদকা দিতে পারলে না এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন তখন তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর। (১৪) আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা আল্লাহ্র গযবে নিপতিত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও দলভুক্ত নয়। তারা জেনেশুনে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। (১৫) আল্লাহ্ তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করে, খুবই মন্দ। (১৬) তারা তাদের শপথকে ঢাল করে রেখেছেন, অতঃপর তারা আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করে। অতএব, তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (১৭) আল্লাহ্র কবল থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (১৮) যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তারা আল্লাহ্র সামনে শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে। তারা মনে করবে যে, তারা কিছু সৎপথে আছে। সাবধান, তারাই তো আসল মিথ্যাবাদী। (১৯) শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। (২০) নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত।

(সাঃ) বলেন ঃ

অর্থাৎ, একজন অপরজনকে দাঁড় করিয়ে তার জায়গায় বসবে না। বরং তোমরা চেপে বসে আগন্তুকের জন্যে জায়গা করে দাও।—(বোখারী, মুসলিম, মুসনাদে-আহমদ, ইবনে-কাসীর)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ –রসূলাহ্ (সাঃ) জনশিক্ষা ও জন-সংস্কারের কাজে দিবারাত্র মশগুল থাকতেন। সাধারণ মজলিসসমূহে উপস্থিত লোকজন তাঁর অমিয়বাণী শুনে উপকৃত হত। এই সুবাদে কিছু লোক তাঁর সাথে আলাদাভাবে গোপন কথাবার্তা বলতে চাইলে তিনি সময় দিতেন। বলাবাহুল্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা সময় দেয়া যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি কষ্টকর ব্যাপার। এতে মুনাফিকদের কিছু দুষ্টামিও শামিল হয়ে গিয়েছিল। তারা খাঁটি মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে একান্তে গমন ও গোপন কথা বলার সময় চাইত এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা বলত। কিছু অজ্ঞ মুসলমানও স্বভাবগত কারণে কথা লম্বা করে মজলিসকে দীর্ঘায়ীত করত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই বোঝা হালকা করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে এই আদেশ অবতীর্ণ করলেন যে, যারা রসূলের সাথে একান্তে কানকথা বলতে চায়, তারা প্রথমে কিছু সদকা প্রদান করবে। কোরআনে এই সদকার পরিমাণ বর্ণিত হয়নি। কিন্তু আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আলী (রাঃ) সর্বপ্রথম একে বাস্তবায়িত করেন। তিনি এক দীনার সদকা প্রদান করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছ থেকে একান্তে কথা বলার সময় নেন।

একমাত্র হযরত আলীই আদেশটি বাস্তবায়িত করেন, এরপর তা রহিত হয়ে যায় এবং আর কেউ বাস্তবায়নের সুযোগ পাননি ঃ আশ্চর্যের বিষয়, আদেশটি জারি করার পর খুব শীঘ্রই রহিত করে দেয়া হয়। কারণ, এর ফলে সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যে অনেকেই অসুবিধার সম্মুখীন হন। হযরত আলী প্রায়ই বলতেন ঃ কোরআনে একটি আয়াত এমন আছে, যা আমাকে ছাড়া কেউ বাস্তবায়ন করেনি—আমার পূর্বেও না এবং আমার পরেও কেউ করবে না। পূর্বে বাস্তবায়ন না করার কারণ তো জানা। পরে বাস্তবায়ন না করার কারণ এই যে, আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, আগে সদকা প্রদান করার আলোচ্য আয়াতই সেই আয়াত।—(ইবনে-কাসীর)

আদেশটি রহিত হয়ে গেছে ঠিক ; কিন্তু এর ইপ্সিত লক্ষ্য এভাবে অর্জিত হয়েছে যে, মুসলমানগণ তো আন্তরিক মহব্বতের তাগিদেই এরূপ মজলিস দীর্ঘায়িত করা থেকে বিরত হয়ে গেল এবং মুনাফিকরা যখন দেখল যে, সাধারণ মুসলমানদের কর্মপন্থার বিপরীতে এরূপ করলে তারা চিহ্নিত হয়ে যাবে এবং মুনাফেকী ধরা পড়বে, তখন তারা এ থেকে বিরত হয়ে গেল।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ এসব আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সেসব লোকের দুরবস্থা ও পরিণামে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আল্লাহ্র শত্রু কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। মুশরিক, ইহুদী, খ্রীষ্টান অথবা অন্য যে কোন প্রকার কাফেরের সাথে কোন মুসলমানের বন্ধুত্ব রাখা জায়েয নয়। এটা যুক্তিগতভাবে সম্ভবপরও নয়। কেননা, মুমিনের আসল সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ্র মহব্বত। কাফের আল্লাহ্র

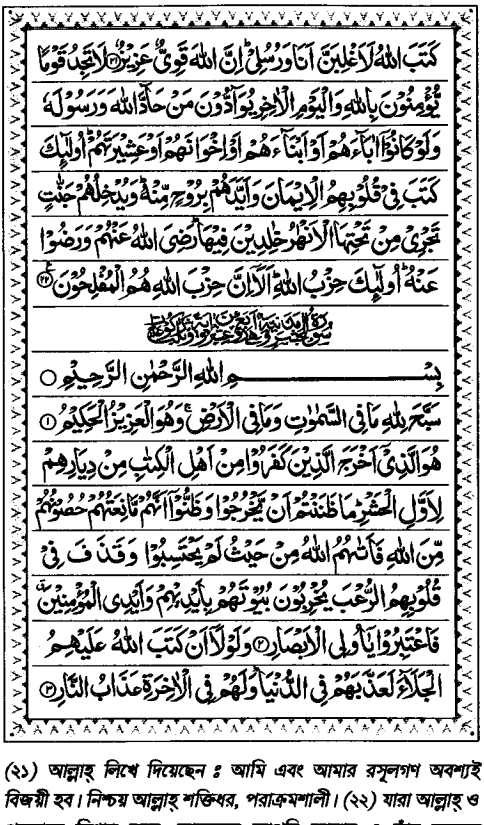

(২১) আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেন ঃ আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২২) যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে।

সূরা আল-হাশর

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ২৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু।

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী। (২) তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে প্রথমবার একত্রিত করে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্র কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ্র শাস্তি তাদের উপর এমনদিক থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন। তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (৩) আল্লাহ্ যদি তাদের জন্যে নির্বাসন অবধারিত না করতেন, তবে তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব।

দুশমন। যার অন্তরে কারও প্রতি সত্যিকার মহব্বত ও বন্ধুত্ব আছে, তার শত্রুর প্রতিও মহব্বত ও বন্ধুত্ব রাখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এ কারণেই কোরআন পাকের অনেক আয়াতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে এবং যে মুসলমান কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখে, তাকে কাফেরদেরই দলভুক্ত মনে করার শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এসব বিধি-বিধান আন্তরিক বন্ধুত্বের সাথে সম্পৃক্ত।

কাফেরদের সাথে সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, অনুগ্রহ, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান করা বন্ধুত্বের অর্থের মধ্যে দাখিল নয়। এগুলো কাফেরদের সাথেও করা জায়েয। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের প্রকাশ্য কাজ-কারবার এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে এসব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা জরুরী যে, এগুলো যেন নিজ ধর্মের জন্যে ক্ষতিকর না হয়, ঈমান ও আমলে শৈথিল্য সৃষ্টি না করে এবং অন্যান্য মুসলমানদের জন্যেও ক্ষতিকর না হয়।

وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ –কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এই আয়াত আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবতাল মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের সাথে বসা ছিলেন, এমন সময় তিনি বললেন ঃ এখন তোমাদের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করবে। তার অন্তর নিষ্ঠুর এবং সে শয়তানের চোখে দেখে। এর কিছুক্ষণ পরই আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবতাল আগমন করল। তার চক্ষু ছিল নীলাভ; দেহবয়ব বেঁটে গোধূম বর্ণ এবং সে ছিল হালকা শ্মশ্রুমণ্ডিত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দেয় কেন? সে শপথ করে বলল ঃ আমি এরূপ করিনি। এরপর সে তার সঙ্গীদেরকেও ডেকে আনল এবং তারাও মিছেমিছি শপথ করল। আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে দিয়েছেন।–(কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলমানের আন্তরিক বন্ধুত্ব কাফেরের সাথে হতে পারে না ঃ

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ ..... كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ প্রথম আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বকারীদের প্রতি আল্লাহ্র গযব ও কঠোর শাস্তির বর্ণনা ছিল। এই আয়াতে তাদের বিপরীতে খাঁটি মুসলমানদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র শত্রু অর্থাৎ, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও আন্তরিক সম্পর্ক রাখে না, যদিও সেই কাফের তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা নিকটাত্মীয়ও হয়।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সবারই এই অবস্থা ছিল। এস্থলে তফসীরবিদগণ অনেক সাহাবীর এমন ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রমুখের মুখ থেকে ইসলাম অথবা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর বিরুদ্ধে কোন কথা শুনে সব সম্পর্ক ছেদ করে দিয়েছেন, তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন এবং কতককে হত্যাও করেছেন।

মাসআলা ঃ পাপাসক্ত ফাসেক-ফাজের ও কার্যতঃ ধর্মবিমুখ মুসলমানদের বেলায়ও অনেক ফেকাহ্বিদ এই বিধান রেখেছেন যে, তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয হতে পারে না। কাজকর্মের প্রয়োজনে সহযোগিতা অথবা প্রয়োজন মাফিক সাহচর্য ভিন্ন কথা, যার মধ্যে ফিস্ক তথা পাপাসক্তির বীজানু বিদ্যমান

আছে, একমাত্র তার অন্তরেই কোন ফাসেক ও পাপাসক্তের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থাকতে পারে। তাই রসূলে খোদা (সাঃ) তাঁর দোয়ায় বলতেন ঃ لا تجعل لفاجر على يدا অর্থাৎ, হে আল্লাহ্ আমাকে কোন পাপাসক্ত ব্যক্তির কাছে ঋণী করো না। অর্থাৎ, তার কোন অনুগ্রহ যেন আমার উপর না থাকে। কেননা, সম্ভ্রান্ত মানুষ স্বভাবগত গুণের কারণে অনুগ্রহকারীর প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখতে বাধ্য হয়। কাজেই ফাসেকদের অনুগ্রহ কবুল করা তাদের প্রতি মহব্বতের সেতু। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই সেতু নির্মাণ থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।—(কুরতুবী)

وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ –এখানে কেউ কেউ রূহ–এর তফসীর করেছেন নূর, যা মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়। এই নূরই তার সৎকর্ম ও আন্তরিক প্রশান্তির উপায় হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এই প্রশান্তি একটি বিরাট শক্তি। আবার কেউ কেউ রূহ–এর তফসীর করেছেন কোরআন ও কোরআনের প্রমাণাদি। কারণ, এটাই মুমিনের আসল শক্তি।—(কুরতুবী)

সূরা আল-হাশ্‌র

যোগসূত্র ও শানে নুযূল ঃ পূর্ববর্তী সূরায় মুনাফিক ও ইহুদীদের বন্ধুত্বের নিন্দা করা হয়েছিল। এই সূরায় ইহুদীদের দুনিয়াতে নির্বাসনদণ্ড ও পরকালে জাহান্নামের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদীদের বৃত্তান্ত এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় আগমন করার পর ইহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে এক গোত্র ছিল বনূ–নুযায়ের। তারাও শান্তিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মদীনা থেকে দু'মাইল দূরে বসবাস করত। একবার আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এর রক্ত বিনিময় আদায় করা মুসলমান–ইহুদী সকলেরই কর্তব্য ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর জন্যে মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুললেন। অতঃপর চুক্তি অনুযায়ী ইহুদীদের কাছ থেকেও রক্ত বিনিময়ের অর্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। সেমতে তিনি বনূ–নুযায়ের গোত্রের কাছে গমন করলেন। তারা দেখল যে, পয়গম্বরকে হত্যা করার এটাই প্রকৃষ্ট সুযোগ। তাই তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল ঃ আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমরা রক্ত বিনিময়ের অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করছি। এরপর তারা গোপনে পরামর্শ করে স্থির করল যে, তিনি যে প্রাচীরের নীচে উপবিষ্ট আছেন, এক ব্যক্তি সেই প্রাচীরের উপরে উঠে একটি বিরাট ও ভারী পাথর তাঁর উপর ছেড়ে দিবে, যাতে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তৎক্ষণাৎ ওহীর মাধ্যমে এই চক্রান্তের বিষয় অবগত হয়ে গেলেন। তিনি সেস্থান ত্যাগ করে চলে এলেন এবং ইহুদীদেরকে বলে পাঠালেন ঃ তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তি লংঘন করেছ। অতএব, তোমাদেরকে দশ দিনের সময় দেয়া হল। এই সময়ের মধ্যে তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। এই সময়ের পর কেউ এস্থানে দৃষ্টিগোচর হলে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। বনূ–নুযায়ের মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে সম্মত হলে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক তাদেরকে বাধা দিয়ে বলল ঃ তোমরা এখানেই থাক। অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার অধীনে দুই হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী আছে। তারা প্রাণ দিবে, কিন্তু তোমাদের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দিবে না। রূহুল–মা'আনীতে আছে, এ ব্যাপারে ওদিয়া ইবনে–মালেক, মুয়ায়েদ এবং রায়েসও আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই–এর সাথে শরীক ছিল। বনূ–নুযায়ের তাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে সদর্পে বলে পাঠাল ঃ আমরা কোথাও যাব না। আপনি যা করতে পারেন, করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে বনূ–নুযায়ের গোত্রকে আক্রমণ করলেন। বনূ–নুযায়ের দুর্গের ফটক বন্ধ করে বসে রইল এবং মুনাফিকরাও আত্মগোপন করল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করলেন এবং তাদের খর্জুর বৃক্ষে আগুন ধরিয়ে দিলেন এবং কিছু কর্তন করিয়ে দিলেন। অবশেষে নিরূপায় হয়ে তারা নির্বাসনদণ্ড মেনে নিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই অবস্থায়ও তাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করে আদেশ দিলেন, আসবাবপত্র যে পরিমাণ সঙ্গে নিয়ে যেতে পার, নিয়ে যাও। তবে কোন অস্ত্র–শস্ত্র সঙ্গে নিতে পারবেনা। এগুলো বাজেয়াপ্ত করা হবে। সে মতে বনূ–নুযায়রের কিছু লোক সিরিয়ায় এবং কিছু লোক খয়বরে চলে গেল। সংসারের প্রতি অসাধারণ মোহের কারণে তারা গৃহের কড়ি–কাঠ, তক্তা ও কপাট পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। ওহুদ যুদ্ধের পর চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে তাদেরকে পুনরায় অন্যান্য ইহুদীর সাথে খয়বর থেকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন। এই নির্বাসনদ্বয়ই 'প্রথম সমাবেশ' ও 'দ্বিতীয়সমবেশ' নামে অভিহিত।—(যাদুল মা'আদ)

সূরা হাশরের বৈশিষ্ট্য ও বনূ–নুযায়ের গোত্রের ইতিহাস ঃ সমগ্র সূরা হাশর ইহুদী বনূ–নুযায়ের গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।—(ইবনে–ইসহাক) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই সূরার নামই 'সূরা বনূ–নুযায়ের' বলতেন।—(ইবনে কাসীর) বনূ–নুযায়ের হযরত হারূন (আঃ) –এর সন্তান–সন্ততিদের মধ্যে একটি ইহুদী গোত্র। তাদের পিতৃপুরুষগণ তওরাতের পণ্ডিত ছিলেন। তওরাতে খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (সাঃ)–এর সংবাদ, আকার–অবয়ব ও আলামত বর্ণিত আছে এবং তাঁর মদীনায় হিজরতের কথাও উল্লেখিত আছে। এই পরিবার শেষনবী (সাঃ)–এর সাহচর্যে থাকার আশায় সিরিয়া থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাদের বর্তমান লোকদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক তওরাতের পণ্ডিত ছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর মদীনায় আগমনের পর তাঁকে আলামত দেখে চিনেও নিয়েছিল যে, ইনিই শেষনবী (সাঃ) কিন্তু তাদের ধারণা ছিল যে, শেষনবী হযরত হারূন (আঃ)–এর বংশধরদের মধ্যে তাদের পরিবার থেকে আবির্ভূত হবেন। তা না হয়ে শেষনবী প্রেরিত হয়েছেন বনী–ইসরাঈলের পরিবর্তে বনী–ইসমাঈলের বংশে। এই প্রতিহিংসা তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনে বাধা দিল। এতদসত্ত্বেও তাদের অধিকাংশ লোক মনে মনে জানত এবং চিনত যে, ইনিই শেষনবী। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিস্ময়কর বিজয় এবং মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় দেখে তাদের বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর স্বীকারোক্তি তাদের মুখে শোনাও গিয়েছিল, কিন্তু এই বাহ্যিক জয়–পরাজয়কে সত্য ও মিথ্যা চিনার মাপকাঠি করাটাই ছিল অসার ও দুর্বলভিত্তি। ফলে ওহুদ যুদ্ধের প্রথমদিকে যখন মুসলমানদের বিপর্যয় দেখা দিল এবং কিছু সাহাবী শহীদ হলেন, তখন তাদের বিশ্বাস টলটলায়মান হয়ে গেল। এরপরই তারা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব শুরু করে দিল।

এর আগে ঘটনা এই হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনা পৌঁছে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে সর্বপ্রথম মদীনায় ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইহুদী গোত্রসমূহের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না এবং কোন আক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না। তারা

আক্রান্ত হলে মুসলমানগণ তাদেরকে সাহায্য করবে। শান্তিচুক্তিতে আরও অনেক ধারা ছিল। 'সীরত ইবনে-হেশামে' এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এমনিভাবে বনু-নুযায়েরসহ ইহুদীদের সকল গোত্র এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে বনু-নুযায়েরের বসতি, দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং বাগ-বাগিচা ছিল।

ওহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত তাদেরকে বাহ্যতঃ এই শান্তিচুক্তির অনুসারী দেখা যায়। কিন্তু ওহুদ যুদ্ধের পর তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন দুরভিসন্ধি শুরু করে দেয়। এই বিশ্বাসঘাতকতার সূচনা এভাবে হয় যে, বনু-নুযায়রের জনৈক সর্দার কা'ব ইবনে-আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর আরও চল্লিশ জন ইহুদীকে সাথে নিয়ে মক্কা পৌঁছে এবং ওহুদ যুদ্ধ ফেরত কোরায়শী কাফেরদের সাথে সাক্ষাত করে। দীর্ঘ আলোচনার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চুক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত হয়। চুক্তিটি পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে কা'ব ইবনে আশরাফ চল্লিশ জন ইহুদীসহ এবং প্রতিপক্ষের আবু সুফিয়ান চল্লিশ জন কোরায়শী নেতাসহ কাবা গৃহে প্রবেশ করে এবং বায়তুল্লাহ্র গেলাফ স্পর্শকরতঃ পারস্পরিক সহযোগিতা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করে।

চুক্তি সম্পাদনের পর কা'ব ইবনে-আশরাফ মদীনায় ফিরে এলে জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং চুক্তির বিবরণ বলে দেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যার আদেশ জারি করেন এবং মুহাম্মদ ইবনে-মাসলামা (রাঃ) সাহাবী তাকে হত্যা করেন।

এরপর বনু-নুযায়রের আরও অনেক চক্রান্ত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অবহিত হতে থাকেন। তন্মধ্যে একটি উপরে শানে-নুযূলে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-কে হত্যার চক্রান্ত করে। যদি ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাৎক্ষণিকভাবে এই চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত না হতেন, তবে তারা হত্যার এই ষড়যন্ত্রে সফলকাম হয়ে যেত। কেননা, যে গৃহের নীচে তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বসিয়েছিল, তার ছাদে চড়ে একটি প্রকাণ্ড ভারী পাথর তাঁর মাথায় ছেড়ে দেয়ার পরিকল্পনা প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। যে ব্যক্তি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয়েছিল, তার নাম ওমর ইবনে-জাহ্হাশ, আল্লাহ্ তাআলার হেফাযতের কারণে এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর ঘটনা ঃ শানে-নুযূলের ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই হত্যাকাণ্ডের রক্ত বিনিময় সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। এ ব্যাপারেই বনু-নুযায়রের চাঁদা লাভ করার জন্যে তিনি তাদের জনপদে গমন করেছিলেন। এর পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে-কাসীর লিখেন ঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের ষড়যন্ত্র ও উৎপীড়নের কাহিনী অতিদীর্ঘ। তন্মধ্যে বীরে-মাউনার ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে সুবিদিত। একবার কিছু সংখ্যক মুনাফিক ও কাফের তাদের জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে একদল সাহাবী প্রেরণ করার আবেদন করে। তিনি সত্তর জন সাহাবীর একটি দল তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পরে জানা যায় যে, এটা নিছক একটা চক্রান্ত ছিল। কাফেরেরা মুসলমানগণকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং এতে তারা সফলও হয়ে যায়। সাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র আমর ইবনে যমীর কোনরূপে পলায়ন করতে সক্ষম হন। যিনি এইমাত্র কাফেরদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর ঊনসত্তর জন সঙ্গীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন, কাফেরদের মোকাবেলায় তাঁর মনোবৃত্তি কি হবে, তা অনুমান করা কারও পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়। ঘটনাক্রমে মদীনায় ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে তিনি দুইজন কাফেরের মুখোমুখী হন। তিনি কালবিলম্ব না করে উভয়কে হত্যাকরেন। পরে জানা যায় যে, তারা ছিল বনী-আমের গোত্রের লোক, যাদের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর শান্তিচুক্তি ছিল।

لِأَوَّلِ الْحَشْرِ -বনু-নুযায়রের এই নির্বাসনকে কোরআন পাক 'আউয়ালে হাশর' তথা প্রথম সমাবেশ আখ্যা দিয়েছে। এর এক কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাচীনকাল থেকে তারা একজায়গায় বসবাস করত। স্থানান্তর ও নির্বাসনের ঘটনা তাদের জীবনে এই প্রথমবার সংঘটিত হয়েছিল। এর আরও একটি কারণ এই যে, ইসলামের ভবিষ্যৎ প্রকৃত নির্দেশ ছিল আরব উপদ্বীপকে অমুসলিমদের থেকে মুক্ত করতে হবে, যাতে এটা ইসলামের এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়। এর ফলে নির্বাসনের আকারে দ্বিতীয় সমাবেশ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। এটা হযরত ফারূকে আযম (রাঃ)-এর খেলাফতকালে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে এবং নির্বাসিত হয়ে যারা খয়বরে বসতি স্থাপন করেছিল তাদেরকে আরব উপদ্বীপ ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এদিক দিয়ে বনু-নুযায়রের এই নির্বাসন, প্রথম সমাবেশ এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে সংঘটিত নির্বাসন, দ্বিতীয় সমবেশ নামে অভিহিত হয়।

فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا -এর শাব্দিক অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের কাছে এমনভাবে আগমন করলেন, যা তারা কল্পনাও করেনি। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্র আগমন করার অর্থ তাঁর নির্দেশ ও নির্দেশবাহক ফেরেশতা আগমন করা।

يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ -গৃহের দরজা, কপাট ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্যে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের গৃহ ধ্বংস করছিল। পক্ষান্তরে তারা যখন দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল, তখন তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্যে মুসলমানগণ তাদের গৃহ ও গাছপালা ধ্বংস করছিল।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٤ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى
اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٥ وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى
رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ
اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝٦
مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ
وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا
يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَ
مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٧
لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝٨ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ
قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ
حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٩

(৪) এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা। (৫) তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্রই আদেশে এবং যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন। (৬) আল্লাহ্ বনূ-বনুযায়রের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ্ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৭) আল্লাহ্ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহ্র, রসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা। (৮) এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ্ তাঁর রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী। (৯) যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ

وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ – لِّيْنَةٍ শব্দের অর্থ খর্জুর বৃক্ষ। বনূ-নুযায়রের খর্জুর বাগান ছিল। তারা যখন দুর্গের ভিতরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন কিছু কিছু মুসলমান তাদেরকে উত্তেজিত ও ভীত করার জন্যে তাদের কিছু খর্জুর বৃক্ষ কর্তন করে অথবা অগ্নিসংযোগ করে খতম করে দিলেন। অপর কিছু সংখ্যক সাহাবী মনে করলেন, ইনশাআল্লাহ্ বিজয় তাদের হবে এবং পনিণামে এসব বাগ-বাগিচা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হবে। এই মনে করে তাঁরা বৃক্ষ কর্তনে বিরত রইলেন। এটা ছিল মতের গরমিল। পরে যখন তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হল, তখন বৃক্ষ কর্তনকারীরা এই মনে করে চিন্তিত হলেন যে, যে বৃক্ষ পরিণামে মুসলমানদের হবে, তা কর্তন করে তারা অন্যায় করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হল। এতে উভয়দলের কার্যক্রমকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে।

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ – اَفَآءَ শব্দটি فَيْءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। দুপুরের পরবর্তী পূর্বদিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছায়াকেও فَيْءٌ বলা হয়। কাফেরদের কাছ থেকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের স্বরূপ এই যে, কাফেররা বিদ্রোহী হওয়ার কারণে তাদের ধন-সম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের মালিকানা থেকে বের হয়ে প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তাআলার দিকে ফিরে যায়। তাই এগুলো অর্জনকে শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ তো এই ছিল যে, কাফেরদের কাছ থেকে অর্জিত সকল প্রকার ধন-সম্পর্কেই فَيْءٌ বলা হত। কিন্তু যুদ্ধ ও জেহাদের মাধ্যমে যে ধন-সম্পদ অর্জিত হয়, তাতে মানুষের কর্ম ও অধ্যবসায়েরও এক প্রকার দখল থাকে। তাই এই প্রকার ধন-সম্পদকে 'গনীমত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ –কিন্তু যে ধন-সম্পদ অর্জনে যুদ্ধ ও জেহাদের প্রয়োজন পড়ে না, তাকে فَيْءٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, যে ধন-সম্পদ যুদ্ধ ও জেহাদ ব্যতিরেকে অর্জিত হয়েছে, তা মুজাহিদ ও যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের আইনানুযায়ী বণ্টন করা হবে না। বরং তা পুরোপুরিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর এখতিয়ারে থাকবে। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা করবেন দেবেন, অথবা নিজের জন্যে রাখবেন। তবে যে কয়েক প্রকার হকদার নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাদের মধ্যেই এই সম্পদের বণ্টন সীমিত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছেঃ

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى এখানে اَهْلِ الْقُرٰى বলে বনূ- নুযায়ের এবং তাদের মত বনূ-কোরায়যা ইত্যাদি গোত্র বোঝানো হয়েছে, যাদের ধন-সম্পদ যুদ্ধ ব্যতিরেকেই অর্জিত হয়েছিল। এরপর পাঁচ প্রকার হকদারদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব আয়াতে উপরোক্ত প্রকার ধন-সম্পদের বিধান, হকদার ও হকদারদের মধ্যে বণ্টন করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আনফালের শুরুতে গনীমতের মাল ও ফায়-এর মালের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জেহাদের ফলশ্রুতিতে যে ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাই গনীমতের মাল

এবং যুদ্ধ ও জেহাদ ব্যতিরেকে যা অর্জিত হয়, তা ফায়-এর মাল। কাফেররা যে ধন-সম্পদ রেখে পলায়ন করে কিংবা যা সম্মতিক্রমে জিযিয়া, খারাজ কিংবা বাণিজ্যিক ট্যাক্সের আকারে প্রদান করে, সবই ফায়-এর অন্তর্ভুক্ত।

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ —যে সম্পদ পরস্পরে আদান-প্রদান হয়, তাকে دُوْلَةً বলা হয়।—(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই যে, উপরোক্ত ধন-সম্পদের হকদার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যাতে এই সম্পদ কেবল তোমাদের ধনী ও বিত্তশালীদের মধ্যকার পুঞ্জীভূত সম্পদ না হয়ে যায়। এতে মূর্খতাযুগের একটি কুপ্রথার মূলোৎপাটনের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কু-প্রথা ছিল এই যে, এ ধরনের সকল ধন-সম্পদ কেবল বিত্তশালীরাই কুক্ষিগত করে নিত এবং এতে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের কোন অংশ থাকত না।

وَمَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ

—এই আয়াত ফায়-এর মাল বন্টন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর উপযুক্ত অর্থ এই যে, ফায় এর মাল সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা হকদারদের শ্রেণী বর্ণনা করেছেন ঠিক, কিন্তু তাদের মধ্যে কাকে কতটুকু দেয়া হবে, তা নির্ধারণ করা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুবিবেচনার উপর রেখে দিয়েছেন। তাই এই আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যাকে যে পরিমাণ দেন, তা সন্তুষ্ট হয়ে গ্রহণ কর এবং যা দেন না, তা পেতে চেষ্টা করো না। অতঃপর وَاتَّقُوا اللّٰهَ বলে এই নির্দেশকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ, এ ব্যাপারে ভ্রান্ত ছলচাতুরীর মাধ্যমে অতিরিক্ত আদায় করে নিলেও আল্লাহ্ তাআলা সব খবর রাখেন। তিনি এজন্যে শাস্তি দেবেন।

রসূলের নির্দেশ কোরআনের নির্দেশের ন্যায় অবশ্য পালনীয় ঃ কিন্তু আয়াতের ভাষা ধন-সম্পদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং শরীয়তের বিধি-বিধানও এতে দাখিল আছে। তাই ব্যাপকভঙ্গিতে আয়াতের এই যে, যে কোন নির্দেশ অথবা ধন-সম্পদ অথবা অন্য কোন বস্তু তিনি কাউকে দেন, তা তার গ্রহণ করা উচিত এবং তদনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে তিনি যে বিষয় নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকা দরকার।

অনেক সাহাবায়ে কেরাম আয়াতের এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রত্যেক নির্দেশকে কোরআনের নির্দেশের অনুরূপ অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত করেছেন। কুরতুবী বলেন ঃ আয়াতে اٰتٰى শব্দে বিপরীতে نهى শব্দ ব্যবহার করায় বোঝা যায় যে, এখানে اٰتٰى শব্দের অর্থ اَمَرَ অর্থাৎ, যা আদেশ করেন। কারণ এটাই نهى এর বিশুদ্ধ বিপরীত শব্দ। তবে কোরআন পাক এর পরিবর্তে اٰتٰى শব্দ এজন্যে ব্যবহার করেছে যাতে 'ফায়' এর মাল বন্টন সম্পর্কিত বিষয়বস্তুও এতে শামিল থাকে। কারণ, এ প্রসঙ্গে আয়াতটি আনা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে এহরাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে দেখে তা খুলে ফেলতে আদেশ করেন। লোকটি বলল ঃ অপনি এ সম্পর্কে কোরআনের কোন আয়াত বলতে পারেন কি যাতে সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, এ সম্পর্কে আয়াত আছে অতঃপর তিনি وَمَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ আয়াতটি পাঠ করে দিলেন। ইমাম শাফেয়ী একবার উপস্থিত লোকজনকে বললেন ঃ আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রশ্নের জওয়াব কোরআন থেকে দিতে পারি। জিজ্ঞাসা কর, যা জিজ্ঞাসা করতে চাও। এক ব্যক্তি আরয করল ঃ এক ব্যক্তি এহ্রাম অবস্থায় প্রজাপতি মেরে ফেলল, এর বিধান কি? ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করে হাদীস থেকে এর বিধান বর্ণনা করে দিলেন।—(কুরতুবী)।

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ —রুকূর শেষ পর্যন্ত এই কয়েকটি আয়াতে দরিদ্র মুহাজির, আনসার ও তাঁদের পরবর্তী সাধারণ উম্মত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাকরণিক দিক দিয়ে لِلْفُقَرَآءِ শব্দটি وَلِذِي الْقُرْبٰى থেকে بدل হয়েছে, যা পূর্বের আয়াতে আছে।—(মাযহারী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের আয়াতে সাধারণতঃ এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরগণকে অভাবগ্রস্ততার কারণে ফায়-এর মালের হকদার গণ্য করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যদিও সকল দরিদ্র ও মিসকীন এই মালের হকদার, কিন্তু তাদের মধ্যে দরিদ্র মুহাজির ও আনসারগণ অগ্রগণ্য। কারণ, তাঁদের ধর্মীয় খেদমত এবং ব্যক্তিগত গুণ-গরিমা সুবিদিত।

মুহাজিরদের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ এতে মুহাজিরগণের প্রথম গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁরা স্বদেশ ও সহায়সম্পত্তি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তাঁরা মুসলমান এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সমর্থক ও সাহায্যকারী শুধু এই অপরাধে মক্কার কাফেররা তাঁদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মাতৃভূমি, ধন-সম্পদ ও বাস্তু-ভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। তাঁদের কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে পেটে পাথর বেঁধে নিতেন এবং কেউ কেউ শীত বস্ত্রের অভাবে গর্ত খনন করে তাতে শীতের দাপট থেকে আত্মরক্ষা করতেন।—(মাযহারী, কুরতুবী)।

মুহাজিরগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا অর্থাৎ, তাঁরা কোন জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং হিজরত করে মাতৃভূমি ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করেননি ; কেবলমাত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিই তাঁদের কাম্য ছিল। এ থেকে তাঁদের পূর্ণ আন্তরিকতা বোঝা যায়। فَضْل শব্দটি প্রায়শঃ পার্থিব নেয়ামতের জন্যে এবং رِضْوَان শব্দটি পারলৌকিক নেয়ামতের জন্যে ব্যবহৃত হয়। কাজেই অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁরা তাঁদের সাবেক ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে এখন ইসলামের ছায়াতলে সাংসারিক প্রয়োজন এবং পরকালের নেয়ামত কামনা করছেন।

মুহাজিরগণের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে ঃ وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ, আল্লাহ্ ও রসূলকে সাহায্য করার জন্যে তাঁর উপরোক্ত সবকিছু করেছেন। আল্লাহ্ তাআলাকে সাহায্য করার অর্থ তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করা। এ ক্ষেত্রে তাঁদের ত্যাগ ও তিতীক্ষা বিস্ময়কর।

তাঁদের চতুর্থ গুণ হচ্ছে ঃ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ —অর্থাৎ, তাঁরাই কথা ও কাজে সত্যবাদী। ইসলামের কলেমা পাঠ করে তাঁরা আল্লাহ্ তাআলা ও রসূলের সাথে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এই আয়াত সকল মুহাজির সাহাবী সত্যবাদী বলে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে। অতএব যে ব্যক্তি তাঁদের কাউকে মিথ্যাবাদী বলে, সে এই আয়াত অস্বীকার করার কারণে মুসলমান হতে

পারে না। নাউযুবিল্লাহ্! রাফেযী সম্প্রদায় তাঁদেরকে মুনাফিক আখ্যা দেয়। এটা এই আয়াতের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। রসূলে করীম (সাঃ) এই ফকীর মুহাজিরগণের ওসীলা দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করতেন। এতেই বোঝা যায় যে, হুযূরের কাছে তাঁদের কি মর্যাদা ছিল।—(মাযহারী)।

আনসারগণের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ – تَبَوَّءُو শব্দের অর্থ অবস্থান গ্রহণ করা। دار বলে হিজরতের স্থান তথা মদীনা তাইয়েবা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) মদীনাকে দুনিয়ার সকল শহর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, দুনিয়ার যেসব শহরে ইসলাম পৌঁছেছে ও প্রসার লাভ করেছে, সেগুলো জেহাদের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে; এমনকি, মক্কা মোকাররমাও। একমাত্র মদীনা শহরই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঈমান ও ইসলামকে বুকে ধারণ করেছে।—(কুরতুবী)।

আয়াতে تَبَوَّءُو ক্রিয়াপদের পর دار এর সাথে ঈমানও উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অবস্থান গ্রহণ কোন স্থান বা জায়গাতেই শুধু হতে পারে। ঈমান কোন জায়গা নয় যে, এতে অবস্থান গ্রহণ করা হবে। তাই কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে خَلَصُوا অথবা تمكنوا ক্রিয়াপদ উহ্য আছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন, ইমানে খাঁটি ও পাকাপোক্ত হয়েছেন। এখানে এরূপও হতে পারে যে, ঈমানকে রূপক ভঙ্গিতে জায়গা ধরে নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। مِن قَبْلِهِمْ অর্থাৎ, মুহাজিরগণের পূর্বে। এতে আনসারগণের একটি শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তা এই যে, যে শহর আল্লাহ্ তাআলার কাছে 'দারুল-হিজরত' ও দারুল ঈমান' হওয়ার ছিল, তাতে তাঁদের অবস্থান ও বসতি মুহাজিরগণের পূর্বেই ছিল। মহাজিরগণের এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই তাঁরা ঈমান কবুল করে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আনসারগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ অর্থাৎ, তাঁরা তাদেরকে ভালবাসে, যারা হিজরত করে তাদের শহরে আগমন করেছেন। এটা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের রুচির পরিপন্থী। সাধারণতঃ লোকেরা এহেন ভিটা-মাটিহীন দুর্গত মানুষকে স্থান দেয়া পছন্দ করে না। সর্বত্রই দেশী ও ভিনদেশীর প্রশ্ন উঠে। কিন্তু আনসারগণ কেবল তাঁদেরকে স্থানই দেননি, বরং নিজ নিজ গৃহে আবাদ করেছেন, নিজেদের ধন-সম্পদে অংশীদার করেছেন এবং অভাবনীয় ইযযত ও সম্ভ্রমের সাথে তাঁদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক একজন মুহাজিরকে জায়গা দেয়ার জন্যে এক সাথে কয়েকজন আনসারী আবেদন করেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত লটারীর মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি করতে হয়েছে।—(মাযহারী)।

তাঁদের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে ঃ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا এই বাক্যের সম্পর্ক একটি বিশেষ ঘটনার সাথে, যা বনূ-নুযায়েরের নির্বাসন এবং তাদের বাগান ও গৃহের উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সংঘটিত হয়েছিল।

উল্লেখিত আয়াতে حَاجَةً বলে প্রয়োজনের বস্তু এবং مِّمَّا أُوتُوا –এর সর্বনাম দ্বারা মুহাজিরগণকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, এই বণ্টনে যা কিছু মুহাজিরগণকে দেয়া হল, মদীনার আনসারগণ সানন্দে তা গ্রহণ করে নিলেন; যেন তাঁদের এসব জিনিসের কোন প্রয়োজন ছিল না। মুহাজিরগণকে দেয়াকে খারাপ মনে করা অথবা অভিযোগ করার তো সামান্যতম কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এর মোকবেলায় যখন বাহরাইন বিজিত হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রাপ্ত ধন-সম্পদ সম্পূর্ণই আনসারগণের মধ্যে বিলি-বণ্টন করে দিতে চাইলেন; কিন্তু তাঁরা তাতে রাযী হলেন না, বরং বললেন ঃ আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুহাজির ভাইগণকেও এই ধন-সম্পদ থেকে অংশ না দেয়া হয়।—(বোখারী, ইবনে-কাসীর)।

আনসারগণের চতুর্থ গুণ এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ – خَصَاصَةٌ শব্দের অর্থ দারিদ্র্য ও উপবাস। ايثار এর অর্থ অপরের বাসনা ও প্রয়োজনকে নিজের বাসনা ও প্রয়োজনের অগ্রে রাখা। আয়াতের অর্থ এই যে, আনসারগণ নিজেদের উপর মুহাজিরগণকে অগ্রাধিকার দিতেন। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে তাঁদের প্রয়োজন মেটাতেন ; যদিও নিজেরাও অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ছিলেন।

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ আনসারগণের আত্মত্যাগ ও আল্লাহ্ তাআলার পথে সবকিছু বিসর্জন দেয়ার কথা বর্ণনা করার পর সাধারণ বিধি হিসেবে বলা হয়েছে যে, যারা মনের কার্পণ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, তারাই আল্লাহ্ তাআলার কাছে সফলকাম। بخل ও شُحّ শব্দদ্বয় প্রায় সমঅর্থবোধক। তবে شُحّ শব্দের মধ্যে কিঞ্চিৎ আতিশয্য আছে। ফলে এর অর্থ অতিশয় কৃপণতা। যাকাত, ফিতরা, ওশর, কোরবানী ইত্যাদি আল্লাহ্ তাআলার ওয়াজেব হক আদায়ের অথবা সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ অভাবগ্রস্ত পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বান্দার ওয়াজিব হক আদায়ের কৃপণতা করা হলে তা নিশ্চিতরূপে হারাম। যে কৃপণতা মুস্তাহাব বিষয় ও দান খয়রাতের ফযীলত অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়, তা মকরূহ ও নিন্দনীয় এবং যা প্রথাগত কাজে প্রতিবন্ধক হয়, তা শরীয়তের আইনে কৃপণতা নয়।

কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা খুবই নিন্দনীয় অভ্যাস। কোরআন ও হাদীসে জোরালো ভাষায় এসবের নিন্দা করা হয়েছে এবং যারা এসব বিষয় থেকে মুক্ত, তাদের জন্যে সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে। উপরে আনসারগণের যে গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তাঁরা কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত ছিলেন।

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا
الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝١٠ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا
يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ
اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ
قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝١١ لَئِنْ اُخْرِجُوْا
لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ
لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۡ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝١٢ لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً
فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ۝١٣
لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَاۗءِ
جُدُرٍ ۭ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ۭ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ
شَتّٰى ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ۝١٤ كَمَثَلِ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ۝١٥ كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ
قَالَ اِنِّىْ بَرِيْۗءٌ مِّنْكَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٦

(১০) আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। (১১) আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফের ভাইদেরকে বলে ঃ তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চিয়ই মিথ্যাবাদী। (১২) যদি তারা বহিষ্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর কাফেররা কোন সাহায্য পাবে না। (১৩) নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। (১৪) তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচণ্ড হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন ; কিন্তু তাদের অন্তর শতধাবিচ্ছিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক কাণ্ডজ্ঞানহীন সম্প্রদায়। (১৫) তারা সেই লোকদের মত, যারা তাদের নিকট অতীতে নিজেদের কর্মের শাস্তিভোগ করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৬) তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে ঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুহাজির ও আনসারগণের পর উম্মতের সাধারণ মুসলমান ঃ وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ—এই আয়াতের بعد অর্থে সাহাবায়ে কেরাম মুহাজির ও আনসারগণের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমান শামিল আছে এবং এই আয়াত তাদের সবাইকে 'ফায়'-এর মালে হকদার সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ইরাক, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি বড় বড় শহর অধিকার করার পর এদের সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করেননি ; বরং এগুলো ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সাধারণ ওয়াক্‌ফ হিসেবে রেখে দিয়েছেন, যাতে এসব সম্পত্তির আমদানি ইসলামী বায়তুল-মালে জমা হয় এবং তা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানগণ উপকৃত হয়। কোন কোন সাহাবী তাঁর কাছে বিজিত সম্পত্তি বণ্টন করে দেয়ার আবেদন করলে তিনি এই আয়াতের বরাত দিয়ে জওয়াব দেন যে, আমার সামনে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রশ্ন না থাকলে আমি যে দেশই অধিকার করতাম, তার সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম, যেমন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খয়বরের সম্পত্তি বণ্টন করে দিয়েছিলেন। এসব সম্পত্তি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ মুসলমানদের জন্যে কি অবশিষ্ট থাকবে?—(মালেক-কুরতুবী)।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালবাসা ও মাহাত্ম্য অন্তরে পোষণ করা মুসলমানদের সত্যপন্থী হওয়ার পরিচায়ক ঃ এস্থলে আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—মুহাজির, আনসার ও অবশিষ্ট সাধারণ মুসলমান। মুহাজির ও আনসারগণের বিশেষ গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বও এস্থলে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলীর মধ্য থেকে মাত্র একটি বিষয় এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সাহাবায়ে কেরামের ঈমানে অগ্রগামিতা এবং তাদের কাছে ঈমান পৌঁছানোর মাধ্যম হওয়ার গুণটিকে সম্যক বুঝে এবং সবার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে। এছাড়া নিজেদের জন্যেও এরূপ দোয়া করে ঃ আল্লাহ্ তাআলা আমাদের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না।

এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলমানদের ঈমান ও ইসলাম কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের মাহাত্ম্য ও ভালবাসা অন্তরে পোষণ করা এবং তাঁদের জন্যে দোয়া করা। যার মধ্যে এই শর্ত অনুপস্থিত, সে মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। এ কারণেই হযরত মূসাব ইবনে সা'দ (রাঃ) বললেন ঃ উম্মতের সকল মুসলমান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে দুই শ্রেণী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ; অর্থাৎ, মুহাজির ও আনসার। এখন সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত পোষণকারী এক শ্রেণী বাকী রয়ে গেছে। তোমরা যদি উম্মতের মধ্যে কোন আসন কামনা কর, তবে এই তৃতীয় শ্রেণীতে দাখিল হয়ে যাও।

হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে (তাঁর শাহাদতের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর) প্রশ্ন করেছিল। তিনি পাল্টা প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত? সে নেতিবাচক উত্তর দিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তবে কি আনসারগণের একজন? সে বলল ঃ না। হযরত হুসাইন (রাঃ) বললেন ঃ এখন তৃতীয় আয়াত وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ বাকী রয়ে গেছে। তুমি যদি হযরত ওসমান গনী (রাঃ) সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও

সংশয় সৃষ্টি করতে চাও, তবে এই তৃতীয় শ্রেণী থেকেও খারিজ হয়ে যাবে।

কুরতুবী বলেন ঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালবাসা রাখা আমাদের জন্যে ওয়াজেব। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে মন্দ বলে অথবা তাঁর সম্পর্কে মন্দ বিশ্বাস রাখে, মুসলমানদের 'ফায়'–এর মালে তার কোন অংশ নেই। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। যেহেতু ফায়–এর মালে প্রত্যেক মুসলমানের অংশ আছে, তাই যার অংশ বাদ পড়বে তার ইসলাম ও ঈমানই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা সকল মুসলমানকে সাহাবায়ে–কেরামের জন্যে এস্তেগফার ও দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ্ তাআলা জানতেন যে, তাঁদের পরস্পরে যুদ্ধ–বিগ্রহও হবে। তাই তাঁদের পারস্পরিক বাদানুবাদের কারণে তাঁদের মধ্য থেকে কারও প্রতি কুধারণা পোষণ করা কোন মুসলমানের জন্যে জায়েয নয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন ঃ আমি তোমাদের নবী (সাঃ)–এর মুখে শুনেছি ঃ এই উম্মত ততদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, যতদিন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে অভিশাপ ও ভর্ৎসনা না করে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ তুমি যদি কাউকে দেখ যে, কেউ কোন সাহাবীকে মন্দ বলছে, তবে তাকে বল ঃ যে তোমাদের মধ্য থেকে অধিক মন্দ, তার উপর আল্লাহ্ তাআলার লানত হোক। বলাবাহুল্য, অধিক মন্দ সাহাবী হতে পারেন না—যে তাঁকে মন্দ বলে সে-ই হবে। সারকথা এই যে, সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে মন্দ বলা লানতের কারণ।

আওয়াম ইবনে হাওশব বলেন ঃ এই উম্মতের পূর্ববর্তীগণ মানুষকে সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলী বর্ণনা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন, যাতে মানুষের অন্তরে তাঁদের ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আমি এ ব্যাপারে তাঁদেরকে একনিষ্ঠভাবে ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে দেখেছি। তাঁরা আরও বলতেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে মতবিরোধ ও বাদানুবাদ সংঘটিত হয়েছে সেগুলো বর্ণনা করো না ; করলে মানুষের ধৃষ্টতা বেড়ে যাবে—(কুরতুবী)।

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا.... —এটা বনু–নুযায়রের দৃষ্টান্ত الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ কারা? এ সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এরা হচ্ছে বদরের কাফের যোদ্ধা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এরা ইহুদী বনু–কায়নুকা। উভয়েরই অশুভ পরিণতি তথা নিহত, পরাজিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা তখন জন সমক্ষে ফুটে উঠেছিল। কেননা, বনু–নুযায়রের নির্বাসনের ঘটনা বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় এবং বনু–কায়নুকার ঘটনাও বদরের পরে সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। বদরে মুশরিকদের সত্তর জন নেতা নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা চরম লাঞ্ছিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। অতএব, হযরত মুজাহিদ (রহঃ)–এর উক্তি অনুযায়ী ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ —বাক্যের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে। এটা পরকালের আগে দুনিয়াতেই তারা ভোগ করেছে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাসে (রাঃ)–এর উক্তি অনুযায়ী আয়াতের অর্থ ইহুদী বনু–কায়নুকা হলে তাদের ঘটনাও তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

বনু কায়নুকার নির্বাসন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) মদীনায় আগমন করার পর মদীনার পার্শ্ববর্তী সবগুলো ইহুদী গোত্রের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। এর এক শর্ত ছিল এই যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুসলমানদের কোন শত্রুকে সাহায্য করবে না। বনু–কায়নুকাও এই শান্তিচুক্তির অধীনে ছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তারা চুক্তির বিপরীত কাজকর্ম শুরু করে দেয়। বদর যুদ্ধের সময় মক্কার কাফেরদের সাথে তাদের গোপন যোগসাজশ ও সাহায্যের কিছু ঘটনাও সামনে আসে। তখন কোরআন পাকের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ অর্থাৎ, চুক্তি সম্পাদনের পর যদি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা দেখা দেয়, তবে আপনি তাদের শান্তিচুক্তি ভণ্ডুল করে দিতে পারেন। বনু–কায়নুকা নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে এই চুক্তি ভঙ্গ করে দিয়েছিল। তাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন এবং হযরত হামযা (রাঃ)–এর হাতে পতাকা দিলেন। মদীনা শহরে হযরত আবুল লুবাবা (রাঃ)–কে স্থলাভিষিক্ত করে তিনি নিজেও জেহাদে রওয়ানা হলেন। মুসলমান সৈন্যবাহিনী দেখে বনু–কায়নুকা দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দুর্গ অবরোধ করে নিলেন। পনর দিন অবরুদ্ধ থাকার পর আল্লাহ্ তাআলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, তাদের বুঝতে বাকী রইল না যে, মোকাবেলা ফলপ্রসূ হবে না। অগত্যা তারা দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে বলল ঃ আমাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে সিদ্ধান্ত নিবেন, আমরা তাতেই সম্মত আছি।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের পুরুষকুলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেন ; কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক বাধ সাধল। সে চূড়ান্ত কাকুতি–মিনতি সহকারে তাদের প্রাণভিক্ষার আবেদন জানাল। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঘোষণা করলেন ঃ তারা বসতি ত্যাগ করে চলে যাবে এবং তাদের ধন–সম্পত্তি যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে পরিগণিত হবে। এই মীমাংসা অনুযায়ী বনু–কায়নুকা মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়ার আমরুয়াত এলাকায় চলে গেল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অধ্যাদেশ অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের ধন–সম্পত্তি বণ্টনকরতঃ একভাগ বায়তুলমালে এবং অবশিষ্ট চার ভাগ যোদ্ধাদের মধ্যে বিলি করে দিলেন।

বদর যুদ্ধের পর এই প্রথম বায়তুলমালে গনীমতের পাঁচ ভাগের একভাগ জমা হল। এই ঘটনা হিজরতের বিশ মাস পর ১৫ই শাওয়াল তারিখে সংঘটিত হয়।

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ —এটা মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত, যারা বনু–নুযায়রকে নির্বাসনের আদেশ অমান্য করতে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানগণ যখন তাদেরকে অবরোধ করে নেয়, তখন কোন মুনাফিক সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়নি। কোরআন পাক শয়তানের একটি ঘটনা দ্বারা তাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছে। শয়তান মানুষকে কুফর করতে প্ররোচিত করেছিল এবং তার সাথে নানারকম ওয়াদা–অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু মানুষ যখন কুফরে লিপ্ত হল, তখন সে ওয়াদা ভঙ্গ করল।

আল্লাহ্ তাআলা জানেন শয়তানের এ ধরনের ঘটনা কত হয়ে থাকবে। তন্মধ্যে একটি ঘটনা তো স্বয়ং কোরআনে সূরা আনফালের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে ঃ

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ۭ وَذٰلِكَ
جَزٰۗؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ
نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ
اَنْفُسَهُمْ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ
النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۭ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ ۝
لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰي جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا
مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۭ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝
هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ
الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ
عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ۭ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

(১৭) অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই জালেমদের শাস্তি। (১৮) মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (১৯) তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য। (২০) জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী, তারাই সফলকাম। (২১) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (২২) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। (২৩) তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। (২৪) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ
وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَاۗءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰي عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّىْ بَرِيْۗءٌ مِّنْكُمْ

এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। এতে শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণার মাধ্যমে অথবা মানবাকৃতিতে সামনে এসে মুশরিকদের মুসলমানদেরকে মোকাবেলায় উৎসাহিত করে এবং সাহায্যের আশ্বাস দেয়। কিন্তু যখন বাস্তবিকই মোকাবেলা শুরু হয়, তখন সাহায্য করতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানায়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে যদি এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে, তখন আপত্তি দেখা দেয় যে, এই ঘটনায় শয়তান বাহ্যতঃ কুফর করার আদেশ দেয়নি। তারা তো পূর্ব থেকেই কাফের ছিল। শয়তান কেবল তাদেরকে মোকাবেলায় একত্রিত হতে বলেছিল। এই আপত্তির জওয়াব এই যে, কুফরে অটল থাকতে বলা এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলাও কুফর করতে বলারই অনুরূপ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হাশরে শুরু থেকে কিতাবী, কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের অবস্থা, কাজ-কারবার ও তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তি বর্ণনা করার পর, সূরার শেষ পর্যন্ত মুমিনদেরকে হুঁশিয়ারী ও সৎকর্ম পরায়ণতার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উল্লেখিত প্রথম আয়াতে বলিষ্ঠভঙ্গিতে পরকালের চিন্তা ও তজ্জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ আছে। বলা হয়েছে ঃ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ অর্থাৎ, মুমিনগণ, আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত পরকালের জন্যে কি প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এ আয়াতে কেয়ামত বোঝাতে গিয়ে لِغَدٍ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামীকাল। এতে তিনটি ইঙ্গিত রয়েছে। প্রথম, সমগ্র ইহকাল পরকালে মোকাবেলায় স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ, এক দিনের সমান। হিসাব করলে একদিনের সমান হওয়াও কঠিন। কেননা, পরকাল চিরন্তন, যার কোন শেষ ও অন্ত নেই। মানব বিশ্বের বয়স তো কয়েক হাজার বছরই বলা হয়। যদি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি থেকে হিসাব করা হয়, তবে কয়েক লাখ বছর হয়ে যাবে। তবুও এটা সীমিত সময়কাল। অসীম ও অশেষ সময়কালের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না।

এক হাদীসে আছে —সারা দুনিয়া একদিন এবং এই দিনে আমাদের রোযা আছে। মানব সৃষ্টি থেকে শুরু করা হোক কিংবা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি থেকে, চিন্তা করলে উভয়টিই মানুষের জন্য গুরুত্ববহ নয় ; বরং প্রত্যেক ব্যক্তির দুনিয়া তার বয়সের বছর ও দিনগুলোই। এই বছর ও দিনগুলো পরকালের তুলনায় কত যে তুচ্ছ ও নগণ্য, তা প্রত্যেকেই অনুমান করতে পারে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত সুনিশ্চিত ; যেমন আজকের পর আগামীকালের আগমন সুনিশ্চিত। কেউ এতে সন্দেহ করতে পারে না। এমনিভাবে দুনিয়ার পরে কিয়ামত ও পরকালের আগমনে কোন সন্দেহ নেই।

তৃতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। আজকের পর আগামীকাল যেমন দূরে নয়—খুব নিকটবর্তী, তেমনি দুনিয়ার পর কিয়ামতও খুব নিকটবর্তী।

কিয়ামত দুই প্রকার—সমগ্র বিশ্বের কিয়ামত ও ব্যক্তি বিশেষের কিয়ামত। প্রথমোক্ত কিয়ামতের অর্থ, আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধ্বংসপ্রাপ্তি। এটা লাখো বছর পরে হলেও পারলৌকিক সময়কালের তুলনায় নিকটবর্তীই। শেষোক্ত কিয়ামত, ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর সাথে সাথে সংঘটিত হয়। তাই বলা হয়েছে ঃ من مات فقد قامت قيامته অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মারা যায়, তার কিয়ামত তখনই কায়েম হয়ে যায়। কারণ, কবর থেকেই পরজগতের ক্রিয়াকর্ম শুরু হয়ে যায় এবং আযাব ও সওয়াবের নমুনা সামনে এসে যায়। কবরজগৎ যার অপর নাম বরযখ, এটা দুনিয়ার "ওয়েটিং রুম" (বিশ্রামাগার) সদৃশ। "ওয়েটিং রুম" ফার্স্ট ক্লাস থেকে নিয়ে থার্ড ক্লাসের যাত্রীদের জন্যে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। অপরাধীদের ওয়েটিং রুম হচ্ছে হাজত ও জেলখানা। এই বিশ্রামাগার থেকেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্তর ও মর্যাদা নির্ধারণ করতে পারে। তাই মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের নিজস্ব কিয়ামত এসে যায়। আল্লাহ্ তাআলা মানুষের মৃত্যুকে একটি ধাঁ-ধার রূপ দিয়ে রেখেছেন। ফলে বড় বড় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণও এর নিশ্চিত সময় নিরূপণ করতে পারে না, বরং প্রতিটি মুহূর্তেই মানুষ আশংকা করতে থাকে যে, পরের ঘন্টাটি তার জীবদ্দশায় অতিবাহিত নাও হতে পারে, বিশেষতঃ বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাবলী একে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত করে দিয়েছে।

সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতকে আগামীকাল বলে উদাসীন মানুষকে সাবধান করা হয়েছে যে, কিয়ামতকে বেশী দূরে মনে করো না। কিয়ামত আগামীকালের মত নিকটবর্তী ; এমনকি আগামীকালের পূর্বেও এসে যাওয়া সম্ভবপর।

مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ —বলে সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার কর্ম বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি সৎকর্ম প্রেরণ করে, সে সওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে অসৎকর্ম প্রেরণ করে, সে সেখানে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হবে। এরপর وَاتَّقُوا اللَّهَ বাক্যটি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর এক কারণ তাকীদ করা এবং অপর সম্ভাব্য কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, প্রথম وَاتَّقُوا اللَّهَ বলে খোদায়ী নির্দেশাবলী পালন করে পরকালের জন্যে সম্বল প্রেরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার وَاتَّقُوا اللَّهَ বলে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যে সম্বল প্রেরণ কর, তা কৃত্রিম ও পরকালে অচল কি না, তা দেখে নাও। পরকালে অচল সম্বল তাই, যা দৃশ্যতঃ সৎকর্ম, কিন্তু তা খাঁটিভাবে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যে করা হয় না ; বরং নাম-যশ অথবা কোন মানসিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে করা হয় অথবা সেই আমল, যা দৃশ্যতঃ এবাদত হলেও ধর্মে তার কোন প্রমাণ না থাকার কারণে বেদআত ও পথভ্রষ্টতা। অতএব, দ্বিতীয় وَاتَّقُوا اللَّهَ বাক্যের সারমর্ম এই যে, পরকালের জন্যে কেবল দৃশ্যতঃ সম্বল যথেষ্ট নয় ; বরং তা অচল কিনা তা দেখে প্রেরণ কর।

فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ —অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্ তাআলাকে ভুলে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই আত্মভোলা হয়ে গেছে। ফলে ভাল-মন্দের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ —এটা একটা দৃষ্টান্ত ; অর্থাৎ, যদি কোরআন পাহাড়ের ন্যায় কঠিন ও ভারী জিনিসের উপর অবতীর্ণ করা হত এবং পাহাড়কে মানুষের ন্যায় জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দেয়া হত, তবে পাহাড়ও কোরআনের মাহাত্ম্যের সামনে নত—বরং ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কিন্তু মানুষ খেয়াল-খুশী ও স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়ে তার স্বভাবজাত চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। সে কোরআন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। অতএব, এটা যেন এক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। কারণ, বাস্তবে পাহাড়ের মধ্যে চেতনা নেই। কেউ কেউ বলেন ঃ পাহাড়, বৃক্ষ ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি বিদ্যমান আছে। কাজেই এটা কাল্পনিক নয়—বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টান্ত।—(মাযহারী)।

পরকালের চিন্তা ও কোরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর উপসংহারে আল্লাহ্ তাআলার কতিপয় পূর্ণত্ববোধক গুণ উল্লেখ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক দৃশ্য-অদৃশ্য ও উপস্থিত-অনুপস্থিত বিষয় পুরোপুরি জানেন। الْقُدُّوسُ —এমনি সত্তা, যিনি প্রত্যেক দোষ থেকে মুক্ত এবং অশালীন বিষয়াদি থেকে পবিত্র। الْمُؤْمِنُ —এই শব্দটি মানুষের জন্যে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় আল্লাহ্ ও রসূলে বিশ্বাসী। আল্লাহ্ তাআলার জন্যে ব্যবহার করলে অর্থ হয় নিরাপত্তা বিধায়ক অর্থাৎ, তিনি ঈমানদারগণকে সর্বপ্রকার আযাব ও বিপদ থেকে শান্তি এবং নিরাপত্তা দান করেন।

الْمُهَيْمِنُ —এর অর্থ দেখাশোনাকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ (রহঃ) তাই বলেছেন।—(মাযহারী, কামুস)।

الْجَبَّارُ —প্রতাপশালী মহান। এই শব্দটি جبر থেকেও উদ্ভূত হতে পারে, যার অর্থ ভাঙা হাড় ইত্যাদি সংযোগ করা। এ কারণেই ভাঙা হাড় জোড়া দেয়ার পর যে পট্টি বাঁধা হয়, তাকে جبيرة বলা হয়। অতএব, অর্থ এই যে, তিনি প্রত্যেক ভাঙা ও অকেজো বস্তুর সংস্কারক।—(মাযহারী)।

الْمُتَكَبِّرُ —এটা كبرياء ও تكبر থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বড়ত্ব, প্রত্যেক বড়ত্ব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার জন্যে নির্দিষ্ট। তিনি কোন বিষয়ে কারও মুখাপেক্ষী নন। যে মুখাপেক্ষী, সে বড় হতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অন্যের জন্যে এই শব্দটি দোষ ও গোনাহ্। কারণ, সত্যিকার বড় না হয়ে বড়ত্ব দাবী করা মিথ্যা এবং আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণে শরীক হওয়ার দাবী। তাই এটা আল্লাহ্ তাআলার জন্যে পূর্ণত্বের গুণ এবং অন্যের জন্যে মিথ্যা দাবী।

الْمُصَوِّرُ —অর্থাৎ, রূপদানকারী। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র সৃষ্টবস্তুকে আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ বিশেষ আকার ও আকৃতি দান করেছেন, যদ্দরুন এক বস্তু অপর বস্তু থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়েছে। আকাশস্থ ও পৃথিবীস্থ সকল সৃষ্টবস্তু বিশেষ আকারের মাধ্যমেই পরিচিত হয়। সৃষ্টবস্তুকর অসংখ্য প্রকারের আলাদা আলাদা আকার-আকৃতি, মানুষের একই শ্রেণীর মধ্যে পুরুষ ও নারীর আকার-আকৃতিতে পার্থক্য, কোটি কোট নারী ও পুরুষের চেহারায় এমন স্বতন্ত্র যে, একজনের মুখাবয়ব অন্যজনের সাথে মিলে না—এটা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই অপার শক্তির কারসাজি। এতে অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়। বড়ত্ব যেমন আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের

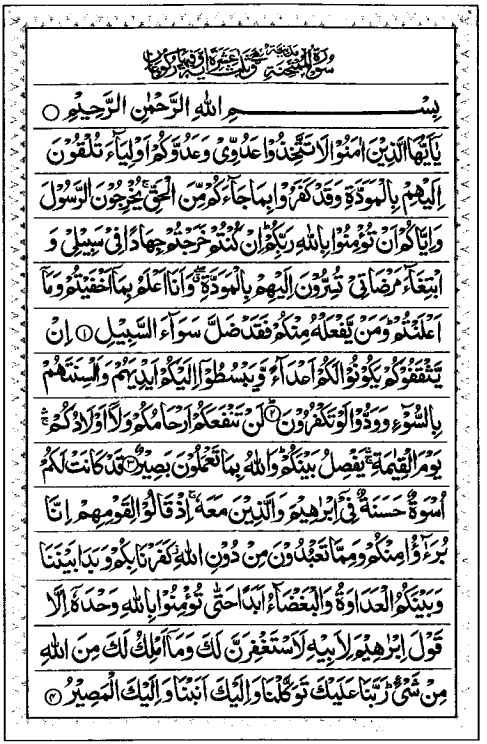

سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَلٰثَ عَشْرَةَ اٰيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ
اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ
وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ
ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ
اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ① اِنْ
يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ
بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ② لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ③ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ
اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا
بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا
قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ
مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ④

সূরা আল-মুমতাহিনা
মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১৩
পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টিলাভের জন্যে এবং আমার পথে জেহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (২) তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফের হয়ে যাও। (৩) তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (৪) তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেন ঃ আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা। আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।

জন্যে বৈধ নয় এবং এটা একমাত্র তাঁরই গুণ, তেমনি চিত্র ও আকার-আকৃতি নির্মাণ অন্যের জন্যে বৈধ নয়। এটাও আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণে তাঁর সাথে অংশীদারিত্ব দাবী করার নামান্তর।

لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার উত্তম উত্তম নাম আছে। কোরআন পাকে এসব নামের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। সহীহ্ হাদীসসমূহে ৯৯টি নাম বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক হাদীসে সবগুলোই উল্লেখিত হয়েছে।

يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ —এই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা অবস্থার মাধ্যমে হলে তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয় ; কেননা, সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও করা অন্তর্নিহিত কারিগরি এবং আকার-আকৃতি নিজ নিজ অবস্থার মাধ্যমে অহর্নিশ স্রষ্টার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনে মশগুল আছে। সত্যিকার উক্তির মাধ্যমে তসবীহ্ পাঠও হতে পারে। কেননা, সুচিন্তিত অভিমত এই যে, প্রত্যেক বস্তুই নিজ নিজ সীমায় চেতনা ও অনভূতি সম্পন্ন। জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার সর্বপ্রথম দাবী হচ্ছে স্রষ্টাকে চেনা ও তাঁর কৃতজ্ঞ হওয়া। অতএব, প্রত্যেক বস্তুর সত্যিকার তসবীহ্ পাঠ করা অসম্ভব নয়। তবে আমরা নিজ কানে তা শুনি না। একারণেই কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ —অর্থাৎ, তোমরা তাদের তসবীহ্ শোন না, বুঝ না।

সূরা হাশরের সর্বশেষ আয়াতসমূহের উপকারিতা ও কল্যাণ ঃ তিরমিযীতে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে তিন বার **اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم** পাঠ করার পর সূরা হাশরের هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ থেকে শেষপর্যন্ত সর্বশেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্যে সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্যে রহমতের দোয়া করবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু হাসিল হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সে-ও এই মর্তবা লাভ করবে।—(মাযহারী)।

সূরা আল-মুমতাহিনা

এই সূরার শুরুভাগে কাফের ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অংশ অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল ঃ তফসীর কুরতুবীতে কুশায়রী ও সা'লাবীর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধের পর মক্কাবিজয়ের পূর্বে মক্কার সারা নাম্নী একজন গায়িকা নারী প্রথমে মদীনায় আগমন করে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছ? সে বলল ঃ না। আবার জিজ্ঞাসা করা হল ঃ তবে কি তুমি মুসলমান হয়ে এসেছ? সে এরও নেতিবাচক উত্তর দিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তা হলে কি উদ্দেশে আগমন করেছ? সে বলল ঃ আপনারা মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আপনারা এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে গেছে।

আমি ঘোর বিপদে পড়ে ও অভাবগ্রস্ত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশে এখানে আগমন করেছি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি মক্কার পেশাদার গায়িকা। মক্কার সেই যুবকরা কোথায় গেল, যারা তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে টাকা-পয়সার বৃষ্টি বর্ষণ করত? সে বলল ঃ বদর যুদ্ধের পর তাদের উৎসবপর্ব ও গান-বাজনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকগণকে তাকে সাহায্য করার জন্যে উৎসাহ দিলেন। তারা তাকে নগদ টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল।

এটা তখনকার কথা, যখন মক্কার কাফেররা হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর আন্তরিক আকাঙ্খা ছিল যে, এই গোপন তথ্য পূর্বাহ্নে মক্কাবাসীদের কাছে ফাঁস না হোক। এদিকে সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হাতেব ইবনে আবী বালতায়া (রাঃ)। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বংশোদ্ভূত এবং মক্কায় এসে বসবাস অবলম্বন করেছিলেন। মক্কায় তাঁর স্বগোত্র বলতে কেউ ছিল না। মক্কায় বসবাসকালেই মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানগণ তখনও মক্কায় ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও অনেক সাহাবীর হিজরতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলমানদের উপর কাফেররা নির্যাতন চালাত এবং তাদেরকে উত্যক্ত করত। যেসব মুহাজিরের আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল, তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা কোনরূপে নিরাপদে ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন যে, তাঁর সন্তান-সন্ততিকে শত্রুর নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব, মক্কাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তাঁর সন্তানদের উপর জুলুম করবে না। তাই গায়িকার মক্কা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন।

হাতেব স্বস্থানে নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাঁস করে দিলে তাঁর কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র লিখে মক্কার কাফেরদেরকে জানিয়ে দেই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার ছেলে-পেলেদের হেফাযত হয়ে যাবে। সুতরাং হাতেব এই ভুলটি করে ফেললেন এবং মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে গায়িকা সারার হাতে সোপর্দ করলেন।—(কুরতুবী, মাযহারী)

এদিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, মহিলাটি এসময়ে রওযায়ে খাক নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

বোখারী ও মুসলিমে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে, আবু মুরসাদকে ও যুবায়র ইবনে আওয়ামকে আদেশ দিলেন, অশ্বে আরোহণ করে সেই মহিলার পশ্চাদ্ধাবন কর। তোমরা তাকে রওযায়ে খাকে পাবে। তার সাথে মক্কাবাসীদের নামে হাতেব ইবনে আবী বালতায়ার পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে পত্রটি ফিরিয়ে নিয়ে আস। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমরা নির্দেশমত দ্রুতগতিতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেস্থানের কথা বলেছিলেন, ঠিক সেস্থানেই আমরা তাকে উটে সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম পত্রটি বের কর। সে বলল ঃ আমার কাছে কারও কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসিয়ে দিলাম। এরপর তালাশ করে কোন চিঠি পেলাম না। আমরা মনে মনে বললাম ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সংবাদ ভ্রান্ত হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে পত্রটি কোথাও গোপন করেছে। এবার আমরা তাকে বললাম ঃ হয় পত্র বের কর, না হয় আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে দিব।

অগত্যা সে নিরুপায় হয়ে পায়জামার ভিতর থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা পত্র নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে চলে এলাম। হযরত ওমর (রাঃ) ঘটনা শুনা মাত্রই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন ঃ এই ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও সকল মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমাদের গোপন তথ্য কাফেরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে। অতএব, অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাতেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাকে এই কাণ্ড করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? হাতের আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমার ঈমানে এখনও কোন তফাৎ হয়নি। ব্যাপার এই যে, আমি ভাবলাম, আমি যদি মক্কাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তবে তারা আমার বাচ্চা-কাচ্চাদের কোন ক্ষতি করবে না। আমি ব্যতীত অন্য কোন মুহাজির এরূপ নেই, যার স্বগোত্রের লোক মক্কায় বিদ্যমান নেই। তাদের স্বগোত্রীয়রা তাদের পরিবার-পরিজনের হেফাযত করে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাতেবের জবানবন্দী শুনে বললেন ঃ সে সত্য বলেছে। অতএব, তার ব্যাপারে তোমরা ভাল ছাড়া মন্দ বলো না। হযরত ওমর (রাঃ) ঈমানের জোশে নিজ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাঁকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ সে কি বদর যোদ্ধাদের একজন নয়? আল্লাহ্ তাআলা বদর যোদ্ধাদেরকে ক্ষমা করার ও তাদের জন্যে জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। একথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আরয করলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলই আসল সত্য জানেন।—(ইবনে-কাসীর) কোন কোন রেওয়ায়েতে হাতেবের এই উক্তিও বর্ণিত আছে যে ; আমি একাজ ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্যে করিনি। কেননা, আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ই বিজয়ী হবেন। মক্কাবাসীরা জেনে গেলেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুমতাহিনার শুরুভাগের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াত উপরোক্ত ঘটনার জন্যে হুশিয়ার করা হয় এবং কাফেরদের সাথে মুসলমানদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা হারাম সাব্যস্ত করা হয়।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে, তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করবে। এতে উল্লেখিত ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ, এ ধরনের পত্র কাফেরদেরকে লিখা বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করারই নামান্তর। আয়াতে কাফের শব্দ বাদ দিয়ে 'আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রু বলে প্রথমতঃ এই নির্দেশের কারণ ও দলীল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিজেদের ও আল্লাহ্র শত্রুর কাছে বন্ধুত্ব আশা করা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ নয়। অতএব, এ থেকে বিরত থাক। দ্বিতীয়তঃ এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাফের যে পর্যন্ত কাফের থাকবে, সে কোন মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। সে আল্লাহ্র দুশমন। অতএব, যে মুসলমান আল্লাহ্ মহব্বত দাবী করে, তার সাথে কাফেরের বন্ধুত্ব কিরূপে সম্ভবপর?

وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ

এখানে حق বলে কোরআন অথবা ইসলাম বোঝানো হয়েছে। এই আয়াতে তাদের শত্রুতার আসল কারণ কুফর বর্ণনা করার পর তাদের বাহ্যিক শত্রুতাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা তোমাদেরকে এবং তোমাদের রসূলকে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছেন। এই বহিষ্কারের কারণ কোন পার্থিব বিষয় নয়। বরং একমাত্র তোমাদের ঈমানই এর কারণ ছিল। অতএব, একথা আর গোপন রইল না যে, তোমরা যে পর্যন্ত মুমিন থাকবে তারা তোমাদের বন্ধু হতে পারে না। হাতেব মনে করেছিল যে, তাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করলে তারা তা পরিবার-পরিজনের হেফাযত করবে। তার এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, ঈমানের কারণে তারা তোমাদের শত্রু। খোদা না করুন, তোমাদের ঈমান বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বন্ধুত্বের আশা করা ধোঁকা বৈ নয়।

إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের হিজরত যদি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র জন্যে ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে ছিল, তবে আল্লাহ্‌র শত্রু কাফেরদের কাছে এই আশা কিরূপে রাখা যায় যে, তারা তোমাদের খাতির করবে।

تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ

এতেও আরও বলা হয়েছে যে, যারা কাফেরদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব রাখে তারা যেন মনে না করে যে, তাদের এই কার্যকলাপ গোপন থেকে যাবে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কাজকর্মের খবর রাখেন; যেমন উল্লেখিত ঘটনায় তিনি তাঁর রসূলকে ওহীর মাধ্যমে অবগত করে চক্রান্ত ধরিয়ে দিয়েছেন।

إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ অর্থাৎ, সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তারা তোমাদের সাথে উদার ব্যবহার করবে, তাদের কাছে এরূপ প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। তারা যখনই তোমাদের উপর প্রাধান্য হাসিল করবে, তখনই তাদের বাহু ও রসনা তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া কোন দিকে প্রসারিত হবে না।

وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ এতে ইঙ্গিত আছে যে, যখন তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে, তখন তাদের বন্ধুত্ব কেবল তোমাদের ঈমানের বিনিময়ে লাভ করতে পারবে। তোমরা কুফরে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়তা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপকারে আসবে না। আল্লাহ্ তাআলা সেদিন এসব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবেন। সন্তানরা পিতা-মাতার কাছ থেকে ও পিতা-মাতারা সন্তানদের কাছ থেকে পলায়ন করবে। এতে হযরত হাতেবের ওযর খণ্ডন করা হয়েছে যে, যে সন্তানদের মহব্বতে তুমি একাজ করেছিলে, মনে রেখ, কিয়ামতের দিন তারা তোমার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছু গোপন নয়।

পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর সমস্ত জ্ঞাতিগোষ্ঠী মুশরিক ছিল। তিনি সবার সাথে শুধু সম্পর্কচ্ছেদই নয়—শত্রুতাও ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যে পর্যন্ত তোমরা বিশ্বাস স্থাপন না করবে এবং শিরক থেকে বিরত না হবে, সেই পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতার প্রাচীর অন্তরায় হয়ে থাকবে।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ থেকে حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

একটি সন্দেহের জওয়াব ঃ উপরের আয়াতে মুসলমানদেরকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উত্তম আদর্শ ও সুন্নত অনুসরণ করার জোর আদেশ দেয়া হয়েছে। ইবরাহীম (আঃ) তার মুশরিক পিতার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন বলেও প্রমাণিত আছে। সূরা তওবায় এর উল্লেখ আছে। অতএব, সন্দেহ হতে পারত যে, মুশরিক পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যেও মাগফেরাতের দোয়া করা ইবরাহিমী আদর্শের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা জায়েয হওয়া উচিত। তাই ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ থেকে একে ব্যতিক্রম প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, অন্যসব বিষয়ে ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ জরুরী, কিন্তু তাঁর এই কাজটির অনুসরণ মুসলমানদের জন্যে জায়েয নয়। إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ আয়াতের মর্ম তাই। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ওযর সূরা তওবায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পিতার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া নিষেধাজ্ঞার পূর্বে করেছিলেন, অথবা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে করেছিলেন যে, তার অন্তরে ঈমান বিদ্যমান আছে, কিন্তু পরে যখন জানলেন যে, সে আল্লাহ্‌র দুশমন, তখন এবিষয় থেকেও নিজের বিমুখতা ঘোষণা করলেন। فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ আয়াতের উদ্দেশ্য তা-ই।

কোন কোন তফসীরবিদ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ কে বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, ইবরাহীম (আঃ) যে, পিতার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করেছিলেন, এটা তাঁর আদর্শের পরিপন্থী নয়। কেননা, তিনি পিতা মুসলমান হয়ে গেছে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে দোয়া করেছিলেন। এরপর যখন তিনি আসল সত্য জানতে পারেন, তখন দোয়া ছেড়ে দেন এবং সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন। এরূপ করা এখনও জায়েয। কোন কাফের সম্পর্কে যদি কারও প্রবল ধারণা থাকে যে, সে মুসলমান, তবে তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করায় কোন দোষ নেই।—(কুরতুবী)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٥ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝٦
عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً
وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٧ لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ
يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَ
تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝٨ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ
الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ
إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝٩
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ
إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا
أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا
أَنفَقُوا ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝١٠

(৫) হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৬) তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা কর, তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ বেপরওয়া, প্রশংসার মালিক। (৭) যারা তোমাদের শত্রু আল্লাহ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সম্ভবতঃ বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ্ সবই করতে পারেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৮) ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। (৯) আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং বহিষ্কারকার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই যালেম। (১০) মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফেরদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফেররা এদের জন্যে হালাল নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা, এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহ্র বিধান ; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, যদিও সেই কাফের আত্মীয়তায় খুবই নিকটবর্তী হয়। সাহাবায়ে-কেরাম আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলী পালনের ব্যাপারে নিজেদের খাহেশ ও আত্মীয় স্বজনের পরওয়া করতেন না। তাঁরা এই নিষেধাজ্ঞাও বাস্তবায়িত করলেন। ফলে দেখা গেল যে, ঘরে ঘরে পিতা-পুত্রের সাথে এবং পুত্র-পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। বলাবাহুল্য, মানবপ্রকৃতি ও স্বভাবের জন্যে এ কাজ সহজ ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা এই সংকটকে অতিসত্বর দূর করার আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন যে, আজ যারা কাফের, ফলে তারা তোমাদের শত্রু ও তোমরা তাদের শত্রু, সত্বরই হয়তো আল্লাহ্ তাআলা এই শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পর্যবসিত করে দিবেন। অর্থাৎ, তাদেরকে ঈমানের তওফীক দিয়ে তোমাদের পারস্পরিক সুসম্পর্ককে নতুন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী মক্কাবিজয়ের সময় বাস্তবরূপ লাভ করে। ফলে নিহতদের বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল কাফের মুসলমান হয়ে যায়।— (মাযহারী) কোরআন পাকের এক আয়াতে এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا অর্থাৎ, তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করবে; বাস্তবেও তাই হয়েছে।

বোখারী ও মুসনাদে আহ্মদের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আসমা (রাঃ)-এর জননী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর স্ত্রী কবীলা হোদায়বিয়া সন্ধির পর কাফের অবস্থায় মক্কা থেকে মদীনায় পৌঁছেন। তিনি কন্যা আসমার জন্যে কিছু উপঢৌকনও সাথে নিয়ে যান। কিন্তু হযরত আসমা (রাঃ) সেই উপঢৌকন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমার জননী আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, কিন্তু তিনি কাফের। আমি তাঁর সাথে কিরূপ ব্যবহার করব? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ জননীর সাথে সদ্ব্যবহার কর।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আসমা (রাঃ)-এর জননী কবীলাকে হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলাম পূর্বকালেই তালাক দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অপর স্ত্রী উম্মে রোমানের গর্ভজাত ছিলেন। উম্মে রোমান মুসলমান হয়ে যান।— (ইবনে-কাসীর, মাযহারী)।

যেসব কাফের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কারেও অংশগ্রহণ করেনি, আলোচ্য আয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার তো প্রত্যেক কাফেরের সাথেও জরুরী। এতে যিম্মি কাফের, চুক্তিতে আবদ্ধ কাফের এবং শত্রু কাফের সবই সমান ; বরং ইসলামে জন্তু - জানোয়ারের সাথেও সুবিচার করা ওয়াজিব ; অর্থাৎ, তাদের পৃষ্ঠে সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপানো যাবে না এবং ঘাস, পানি ও বিশ্রামের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ এই আয়াতে সেই সব কাফেরের বর্ণনা আছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকে এবং

মুসলমানদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কারে অংশগ্রহণ করে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন। এতে অনুগ্রহমূলক কাজ কারবার করতে নিষেধ করা হয়নি; বরং শুধু আন্তরিক বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ কেবল যুদ্ধরত শত্রুদের সাথেই নয়; বরং যিম্মী ও চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের সাথেও জায়েয নয়। এ থেকে তফসীরে-মাযহারীতে মাসআলা বের করা হয়েছে যে, যুদ্ধরত কাফেরদের সাথে ন্যায় ও সুবিচার করা তো জরুরীই; নিষিদ্ধ নয়। এথেকে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার যুদ্ধরত শত্রুদের সাথেও জায়েয। তবে অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে এর জন্যে শর্ত এই যে, তাদের সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহারের কারণে মুসলমানদের কোনরূপ ক্ষতি হওয়ার আশংকা যেন না থাকে। আশংকা থাকলে জায়েয নয়। তবে ন্যায় ও সুবিচার প্রত্যেকের সাথে সর্বাবস্থায় জরুরী ও ওয়াজিব।

শানে-নুযূলের ঘটনা ঃ আলোচ্য আয়াতগুলোও একটি বিশেষ ঘটনা অর্থাৎ, হোদায়বিয়ার সন্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সূরা ফাত্হের শুরুতেই এই সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই সন্ধির যেসব শর্ত ছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি কাফেরদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দেয়া হবে না, পরন্তু কাফেরদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দিতে হবে। সেমতে কিছু মুসলমান পুরুষ কাফেরদের মধ্য থেকে আগমন করে এবং তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়। এরপর কয়েকজন নারী মুসলমান হয়ে আগমন করে। তাদের কাফের আত্মীয়রা তাদেরকে প্রত্যর্পণের আবেদন জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতগুলো হোদায়বিয়ায় অবতীর্ণ হয়। এতে নারীদেরকে ফেরত পাঠাতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সন্ধিপত্রের ব্যাপকতা সংকুচিত ও রহিত হয়ে গেছে। এ ধরনের নারীদের ব্যাপারে কিছু বিশেষ বিধানও নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর সাথে এমন নারীদের ব্যাপারেও কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে, যারা প্রথমে মুসলমানদের বিবাহিতা ছিল; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং মক্কাতেই থেকে যায়। মুসলমান হওয়াই এই নারীদের বেলায় আসল ভিত্তি বিধায় তাদের ঈমান পরীক্ষা করার পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মক্কাবাসীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হোদায়বিয়ার বিখ্যাত শান্তিচুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, মক্কা থেকে কোন ব্যক্তি মদিনায় চলে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিবেন যদিও সে মুসলমান হয়। কিন্তু মদীনা থেকে কেউ মক্কায় চলে গেলে কোরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই বাহ্যতঃ অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ, কোন মুসলমান পুরুষ অথবা নারী মক্কা থেকে মদীনায় চলে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে ফেরত পাঠাবেন।

এই চুক্তি সম্পাদন শেষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন হোদায়বিয়াতেই অবস্থানরত ছিলেন তখন মুসলমানদের জন্যে অগ্নি পরীক্ষাতুল্য একাধিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি ঘটনা হযরত আবু জন্দল (রাঃ)-এর। কোরাইশরা তাকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল। তিনি কোন রকমে সেখান থেকে পালিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ভীষণ উদ্বেগ দেখা দিল যে, চুক্তির শর্তানুযায়ী তাঁকে ফেরত পাঠানো উচিত কিন্তু আমরা আমাদের একজন নির্যাতিত ভাইকে যালেমদের হাতে পুনরায় তুলে দিব এটা কিরূপে সম্ভব?

কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি শরীয়তের নীতিমালার হেফাযত ও তৎপ্রতি দৃঢ়তা এক ব্যক্তির কারণে বিসর্জন দিতে পারতেন না। এর সাথে সাথে তাঁর দূরদর্শী অন্তর্দৃষ্টি সত্বরই এই নির্যাতিতদের বিজয়ীসুলভ মুক্তিও যেন প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছিল। স্বভাবগত কারণেই তিনিও আবু জন্দল (রাঃ)-কে ফেরত প্রত্যর্পণে দুঃখিত হয়ে থাকবেন, কিন্তু চুক্তি পালনের খাতিরে তাঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বিদায় করে দিলেন।

এর সাথে সাথেই দ্বিতীয় একটি ঘটনা সংঘটিত হল। মুসলমান সাঈদা বিনতে হারেস (রাঃ) কাফের সায়ফী ইবনে আনসারের পত্নী ছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে সায়ফীর নাম মুসাফির মখযুমী বলা হয়েছে। তখন পর্যন্ত মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম ছিল না। এই মুসলমান মহিলা মক্কা থেকে পালিয়ে হোদায়বিয়ায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। সাথে সাথে স্বামীও হাযির। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে দাবী জানাল যে, আমার স্ত্রীকে আমার কাছে প্রত্যর্পণ করা হোক। কেননা, আপনি এই শর্ত মেনে নিয়েছেন এবং চুক্তিপত্রের কালি এখনও শুকায়নি।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। এর পরিণতিতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান নারী হিজরত করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছে গেলে তাকে কাফেরদের হাতে ফেরত দেয়া হবে না—সে পূর্ব থেকেই মুসলমান হোক; যেমন উল্লেখিত সাঈদা অথবা হিজরতের পর তার মুসলমানত্ব প্রমাণিত হোক। তাকে ফেরত না দেয়ার কারণ এই যে, সে তার কাফের স্বামীর জন্যে হালাল নয়। তফসীরে কুরতুবীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এই ঘটনা বর্ণিত রয়েছে।

মোটকথা উল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতরণের ফলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, চুক্তিপত্রের উপরোক্ত শর্তটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয় যে, পুরুষ অথবা নারী যে কোন মুসলমান আগমন করুক, তাকে ফেরত দিতে হবে। বরং এই শর্তটির ব্যাপকতা কেবল পুরুষদের ক্ষেত্রে গ্রহণীয়—নারীদের ক্ষেত্রে নয়। নারীদের ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, যে নারী মুসলমান হয়ে হিজরত করে, তার কাফের স্বামী মোহরানার আকারে যা কিছু তার পিছনে ব্যয় করেছে, তা তাকে ফেরত দেয়া হবে। এসব আয়াতের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) চুক্তিপত্রের উল্লেখিত এই শর্তের সঠিক মর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং তদনুযায়ী সাঈদা (রাঃ)-কে কাফেরদের কাছে ফেরত প্রেরণে বিরত থাকেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম বিনতে-ওতবা মক্কা থেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তার পরিবারের লোকেরা শর্তের ভিত্তিতে তাকে ফেরৎ দানের দাবী জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ নাযিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম আমর ইবনে-আস (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। স্বামী তখনও মুলসমান ছিল না। উম্মে-কুলসুম ও তাঁর দুই ভাই মক্কা থেকে পলায়ন করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে চলে যান। সাথে সাথেই তাঁদেরকে ফেরত পাঠানোর দাবী উঠে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শর্ত অনুযায়ী আম্মারা ও ওলীদ ভ্রাতৃদ্বয়কে ফেরত পাঠিয়ে দেন; কিন্তু উম্মে কুলসুমকে ফেরত দেননি। তিনি বললেন ঃ এই

শর্ত পুরুষদের জন্যে, নারীদের জন্যে নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সত্যায়নে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

এমনি ধরনের আরও কয়েকজন নারীর ঘটনা রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। বলাবাহুল্য এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। সবগুলা ঘটনাই সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কুরতুবীর উল্লেখিত রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, চুক্তির উপরোক্ত ধারার ভাষা যদিও ব্যাপক ছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর মতে তাতে নারীরা শামিল ছিল না। তাই তিনি হোদায়বিয়াতেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দেন এবং এরই সত্যায়নে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

সারকথা এই যে, এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক। নারীরা এর অন্তর্ভুক্ত না থাকার বিষয়টি পূর্ব থেকেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর দৃষ্টিতে ছিল ; কিংবা আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি নারীদেরকে শর্ত থেকে খারিজ করে দেন। উভয় অবস্থাতেই কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে এই চুক্তি এরপরও পূর্ণাঙ্গরূপে বলবৎ ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা পালিত হয়। কাজেই এক ব্যাখ্যাকে চুক্তিভঙ্গকরণ অথবা খতমকরণ রূপে গণ্য করা যায় না। অতঃপর ভাষাদৃষ্টে আয়াতসমূহের অর্থ অনুধাবন করুন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, নারীদের মুসলমান ও মুমিন হওয়াই সন্ধির শর্ত থেকে তাদের ব্যতিক্রমভুক্ত হওয়ার কারণ। মক্কা থেকে মদীনায় আগমনকারিণী নারীদের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনাও ছিল যে, তাদের কেউ ইসলাম ও ঈমানের খাতিরে নয়, বরং স্বামীর সাথে ঝগড়া করে অথবা মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে বা অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে হিজরত করেছে। এরূপ নারী আল্লাহ্‌র কাছে এই শর্তের ব্যতিক্রমভুক্ত নয় ; বরং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তাকে ফেরত পাঠানো জরুরী। তাই মুসলমানগণকে আদেশ করা হয়েছে যে, যেসব নারী হিজরত করে মদীনায় আসে, তাদের ঈমান পরীক্ষা করে নাও। এর সাথেই বলা হয়েছেঃ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যিকার ও আসল ঈমানের সম্পর্ক তো অন্তরের সাথে, যার খবর আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। তবে মৌখিক স্বীকারোক্তি ও লক্ষণাদিদৃষ্টে ঈমান সম্পর্কে অনুমান করা যায়। সুতরাং মুলমানগণকে এ বিষয়েরই আদেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন ঃ মুহাজির নারীকে শপথ করানো হত যে, সে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার কারণে আগমন করেনি, মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে আসেনি এবং অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের বশবর্তী হয়ে হিজরত করেনি ; বরং একান্তভাবে আল্লাহ্ ও তার রসূলের ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আগমন করেছে। যে নারী এই শপথ করত, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে মদীনায় বসবাসের অনুমতি দিতেন এবং সে তার স্বামীর কাছ থেকে যে মোহরানা ইত্যাদি আদায় করেছিল, তা তার স্বামীকে ফেরত দিয়ে দিতেন।—(কুরতুবী)

তিরমিযীতে হযরত আয়েশা (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতক্রমে বলা হয়েছেঃ নারীদের পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল সেই আনুগত্যের শপথ, যা পরবর্তী আয়াতসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ, إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ মুহাজির নারীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর হাতে আয়াতে বর্ণিত বিষয়সমূহের শপথ করত। এটাও অসম্ভব নয় যে, প্রথমে তাদেরকে সেসব বাক্যও উচ্চারণ করানো হত, যেগুলো হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে। এরপর আয়াতে বর্ণিত শপথ দ্বারা তা পূর্ণ করা হত।

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ অর্থাৎ, পরীক্ষার পর যদি তারা মুমিন প্রতিপন্ন হয়, তবে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠানো বৈধ নয়।

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ অর্থাৎ, এই নারীরা কাফের পুরুষদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফের পুরুষরাও তাদের জন্যে হালাল নয় যে, তাদেরকে পুনর্বিবাহ করবে।

এই আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, যে নারী কোন কাফেরের বিবাহাধীনে ছিল, এরপর সে মুসলমান হয়ে গেছে, তার বিবাহ কাফেরের সাথে আপনা–আপনি ভঙ্গ হয়ে গেছে, তারা একে অপরের জন্যে হারাম। নারীদেরকে সন্ধির শর্ত থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত রাখার কারণ এটাই।

وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟ অর্থাৎ, মুহাজির মুসলমান নারীর কাফের স্বামী বিবাহের মোহরানা ইত্যাদি বাবত যা ব্যয় করেছে, তা সবই তার স্বামীকে ফেরত দাও। কেননা, নারীকে ফেরত দেয়াই কেবল সন্ধি–শর্তের ব্যতিক্রমভুক্ত ছিল, যা হারাম হওয়ার কারণে সম্ভবপর নয়, কিন্তু স্বামীর প্রদত্ত ধন–সম্পদ শর্ত অনুযায়ী ফেরত দেয়া উচিত। মুহাজির নারীকে সরাসরি এই ধন–সম্পদ ফেরত দিতে বলা হয়নি ; বরং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা ফেরত দাও। কারণ, স্বামী প্রদত্ত ধন–সম্পদ খতম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ফলে নারীদের কাছ থেকে ফেরত দেয়ানো সম্ভবপর নয় বিধায় বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্বে দেয়া হয়েছে। যদি বায়তুলমাল থেকে দেয়া সম্ভবপর হয়, তবে সেখান থেকে, নতুবা মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে দেয়া হবে।—(কুরতুবী)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ পূর্বের আয়াত থেকে বোঝা গেছে যে, মুহাজির মুসলমান নারীর বিবাহ তার কাফের স্বামীর সাথে ভঙ্গ হয়ে গেছে। এই আয়াতে তারই পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে, এখন মুসলমান পুরুষের সাথে তার বিবাহ হতে পারে ; যদিও প্রাক্তন কাফের স্বামী জীবিত থাকে এবং তালাকও না দেয়।

আলোচ্য আয়াতে إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ বাক্যটি শর্তরূপে উল্লেখিত হয়েছে ; অর্থাৎ, তোমরা এই নারীদেরকে মোহরানা দিয়ে দেয়ার শর্তে বিবাহ করতে পার। এটা প্রকৃতপক্ষে বিবাহের শর্ত নয়। কেননা, সবার মতেই বিবাহ মোহরানা আদায় করার উপর নির্ভরশীল নয়, তবে বিবাহের কারণে মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব অবশ্যই। এখানে একে শর্তরূপে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এই মাত্র এক মোহরানা কাফের স্বামীকে ফেরত দেয়ানো হয়েছে। কাজেই বিবাহকারী মুসলমান মনে করতে পারে যে, নতুন মোহরানা দেয়ার আর আবশ্যকতা নেই। এই ভ্রান্তি দুর করার জন্যে বলা হয়েছে যে, বিগত মোহরানার সম্পর্ক বিগত বিবাহের সাথে ছিল। এটা নতুন বিবাহ ; কাজেই এর জন্যে নতুন মোহরানা অপরিহার্য।

وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ – عصمة শব্দটি عصم এর বহুবচন। এর

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا
الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ
اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاۗءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ
عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـــًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا
يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ
اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَىِٕسُوْا مِنَ
الْاٰخِرَةِ كَمَا يَىِٕسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ۝

سُوْرَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ اَرْبَعَ عَشْرَةَ اٰيَةً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا
عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝

(১১) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে থেকে যায়, অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও, তখন যাদের স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ। (১২) হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (১৩) মুমিনগণ, আল্লাহ্ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে যেমন কবরস্থ কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে।

সূরা আছ-ছফ্

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ১৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাবান। (২) মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? (৩) তোমরা যা করনা, তা বলা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই অসন্তোষজনক। (৪) আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর।

আসল অর্থ সংরক্ষণ ও সংহতি। এখানে বিবাহবন্ধন ইত্যাদি সংরক্ষণযোগ্য বিষয় বোঝানো হয়েছে।

عِصَمُ الْكَوَافِرِ শব্দটি عِصْمَةٌ كَوَافِرَةٌ এর বহুবচন। এখানে মুশরিক রমণী বোঝানো হয়েছে। কেননা, কিতাবী কাফের রমণীকে বিবাহ্ করা কোরআনে সিদ্ধ রাখা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ পর্যন্ত মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে যে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ ছিল, তা খতম করে দেয়া হল। এখন কোন মুসলমানের বিবাহ মুশরিক নারীর সাথে বৈধ নয়। পূর্বে যে বিবাহ হয়েছে, তাও খতম হয়ে গেছে। এখনও কোন-মুশরিক নারীকে বিবাহে আবদ্ধ রাখা হালাল নয়।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময় যে সাহাবীর কোন মুশরিক স্ত্রী ছিল, তিনি তাকে ছেড়ে দেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর বিবাহে দুইজন মুশরিক নারী ছিল। হিজরতের সময় তারা মক্কায় রয়ে গিয়েছিল। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি তাদেরকে তালাক দিয়ে দেন।—(মাযহারী) এখানে তালাকের অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ করা। পারিভাষিক তালাকের এখানে প্রয়োজনই নেই। কেননা, আয়াত বলেই তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়।

وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا অর্থাৎ, যখন মুসলমান নারীকে মক্কায় ফেরত পাঠানো হবে না এবং তার মোহরানা স্বামীকে ফেরত দেয়া হবে, এমনিভাবে যদি কোন মুসলমান নারী ধর্মত্যাগী হয়ে মক্কায় চলে যায় অথবা পূর্ব থেকেই কাফের থাকার কারণে মুসলমান স্বামীর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মুসলমান স্বামীকে তার মোহরানা ফেরত দেয়া কাফেরদের দায়িত্ব হয়, তখন পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে এসব লেন-দেনের মীমাংসা করে নেয়া কর্তব্য। উভয়পক্ষ যে মোহরানা ইত্যাদি দিয়েছে তা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে তদনুযায়ী লেন-দেন করে নেয়া উচিত।

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ .....

عَاقَبْتُمْ শব্দটি معاقبة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রতিশোধ নেয়াও হয়ে থাকে। এখানে এই অর্থও হতে পারে। (কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানদের কিছুসংখ্যক স্ত্রীলোক যদি কাফেরদের হাতে থেকে যায়, তবে তাদের মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ইত্যাদি ফেরত দেয়া কাফেরদের জন্যে জরুরী ছিল, যেমন মুসলমানদের পক্ষ থেকে মুহাজির নারীদের কাফের স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দেয়া হয়েছে। কিন্তু কাফেররা এরূপ করল না এবং মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দিল না। এখন তোমরা যদি এর প্রতিশোধ নাও এবং কাফেরদের প্রাপ্য মোহরানা তোমাদের প্রাপ্য পরিমাণে আটক কর, তবে এর বিধান এই যে,

فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا অর্থাৎ, তোমরা মুহাজির নারীদের দেয়া আটককৃত মোহরানা থেকে সেই মুসলমান স্বামীদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণে দিয়ে দাও, যাদের স্ত্রী কাফেরদের হাতে রয়ে গেছে।

عَاقَبْتُمْ এর অপর অর্থ যুদ্ধে সম্পদ হাসিল করাও হয়ে থাকে। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যেসব মুসলমানের স্ত্রী কাফেরদের হাতে চলে গেছে এবং শর্ত অনুযায়ী কাফেররা মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা দেয়নি, এরপর মুসলমানেরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করেছে, এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকেই মুসলমান স্বামীদের প্রাপ্য দিতে হবে।—(কুরতুবী)

নারীদের আনুগত্যের শপথ ঃ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ এ আয়াতে মুসলমান নারীদের কাছ থেকে একটি বিস্তারিত আনুগত্যের শপথ নেয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ঈমান ও আকায়েদসহ শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করারও অঙ্গীকার রয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতদৃষ্টে যদিও এই শপথ মুহাজির নারীদের ঈমান পরীক্ষার পরিশিষ্ট হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার কারণে এটা শুধু তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়। বরং সব মুসলমান নারীর জন্যে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বাস্তব ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে শুধু মুহাজির নারীরাই নয়, অন্যান্য নারীরাও শপথ করেছে। সহীহ্ বোখারীর রেওয়ায়েতে হযরত ওমায়মা বর্ণনা করেন ঃ আমি আরও কয়েকজন মহিলাসহ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে শপথ করেছি। তিনি আমাদের কাছ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নেন এবং সাথে সাথে এই বাক্যও উচ্চারণ করান فيما استطعتن واطقتن অর্থাৎ, আমরা এসব বিষয় পালনে অঙ্গীকার করি যে পর্যন্ত আমাদের সাধ্যে কুলায়। ওমায়মা এরপর বলেন ঃ এথেকে জানা গেল যে, আমাদের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর স্নেহ-মমতা আমাদের নিজেদের চাইতেও বেশী ছিল। আমরা তো নিঃশর্ত অঙ্গীকারই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে শর্তযুক্ত অঙ্গীকার শিক্ষা দিলেন। ফলে অপারগ অবস্থায় বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল হবে না—(মাযহারী)

সহীহ্ বোখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) এই শপথ সম্পর্কে বলেন ঃ মহিলাদের এই শপথ কেবল কথাবার্তার মাধ্যমে হয়েছে—হাতের উপর হাত রেখে শপথ হয়নি, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে হত। বস্তুতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাত কখনও কোন গায়র মাহ্রাম নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি।—(মাযহারী)

হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, এই শপথ কেবল হোদায়বিয়ার ঘটনার পরেই নয় ; বরং বারবার হয়েছে। এমনকি, মক্কাবিজয়ের দিনও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পুরুষদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করে সাফা পর্বতের উপর নারীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে হযরত ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাক্যাবলী নীচে সমবেত মহিলাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন।

তখন যারা আনুগত্যের শপথ করেছিল, তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও ছিল। সে প্রথমে লজ্জাবশতঃ নিজেকে গোপন রাখতে চেয়েছিল, এরপর শপথের কিছু বিবরণ জিজ্ঞাসা করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সে একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।—(মাযহারী)

يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ মহিলাদের জন্য শপথের প্রথম বিষয় ছিল ঈমান অবলম্বন করা এবং শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সাধারণ পুরুষদের শপথেও ছিল। দ্বিতীয় বিষয় চুরি না করা। অনেক নারীই স্বামীর ধন-সম্পদ চুরি করতে অভ্যস্ত ছিল। তাই এটা উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বিষয় ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা। এতে নারীরা পাকাপোক্ত হলে পুরুষদের জন্যেও আত্মরক্ষা করা সহজ হয়ে যায়। চতুর্থ বিষয় নিজ সন্তানকে হত্যা না করা।

মূর্খতাযুগে কন্যাসন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করার প্রচলন ছিল। আয়াতে একে রোধ করা হয়েছে। পঞ্চম বিষয় মিথ্যা অপবাদ ও কলংক আরোপ না করা। এই নিষেধাজ্ঞার সাথে একথাও আছে যে, بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ অর্থাৎ, নিজের হাত ও পায়ের মাঝখানে যেন অপবাদ আরোপ না করে। এর কারণ এই যে, কেয়ামতের দিন মানুষের হস্ত-পা-ই তার ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের পাপকর্ম করার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যে, আমি চারজন সাক্ষীর মাঝখানে এই কাজ করছি। এরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে একটি সাধারণ বিধি। তা এই যে, وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ অর্থাৎ, তারা ভাল কাজে আপনার আদেশ অমান্য করবে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে কোন কাজের আদেশ দিবেন, তা ভাল না হয়ে পারে না। এর ব্যতিক্রম নিশ্চিত অসম্ভব। এমতাবস্থায় 'ভালকাজে' কথাটি যুক্ত করার কারণ কি? এর এক কারণ তো এই যে, মুলমানরা যেন ভাল করে বোঝে নেয় যে, আল্লাহ্র আদেশের বিপরীতে কোন মানুষের আনুগত্য করা জায়েয নয় ; এমনকি, সেই মানুষটি যদি রসূলও হন, তবুও নয়। তাই রসূলের আনুগত্যের সাথেও এই শর্তটি যুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, এখানে ব্যাপার নারীদের। তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কোন আদেশেরই খেলাফ করবে না, এরূপ ব্যাপক আনুগত্যের কারণে শয়তান কারও মনে পথভ্রষ্টতার কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারত। এই পথ বন্ধ করার জন্যে শর্তটি যুক্ত করা হয়েছে।

সূরা আছ-ছফ্

শানে-নুযূল ঃ তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একদল সাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোন্‌টি আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তবে তা বাস্তবায়িত করতাম। বগভী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তারা কেউ কেউ একথাও বললেন যে, আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি জানতে পারলে আমরা তজ্জন্যে জান ও মাল সব বিসর্জন করতাম।—(মাযহারী)

ইবনে-কাসীর মুসনাদে আহমদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা একত্রিত হয়ে পরস্পরে এই আলোচনা করার পর একজনকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্যে প্রেরণ করতে চাইলেন, কিন্তু কারও সাহস হল না। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। (ফলে বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে তাঁদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।) তাঁরা দরবারে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁদেরকে সমগ্র সূরা ছফ্ পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন, যা তখনই নাযিল হয়েছিল।

এই সূরা থেকে জানা গেল যে, তাঁরা সর্বাধিক প্রিয় যে আমলটির সন্ধানে ছিলেন, সেটি হচ্ছে আল্লাহ্র পথে জেহাদ। তাঁরা এ সম্পর্কে যেসব বড় বড় বুলি আওড়িয়েছিলেন এবং জীবনপণ করার দাবী উচ্চারণ করেছিলেন, সে সম্পর্কেও সূরায় সাথে সাথে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোন মুমিনের জন্যে এ ধরনের বুলি আওড়ানো দুরস্ত নয়। কারণ, যথাসময়ে সে তার সংকল্প পূর্ণ করতে পারবে কি না, তা তার জানা নেই। সংকল্প পূর্ণ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া এবং বাধা অপসারিত হওয়া তার ক্ষমতাধীন নয়। এছাড়া স্বয়ং তার হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি আন্তরিক সংকল্পও তার কব্জায় নয়। এ কারণেই কোরআন পাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কেও শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে,

وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ
رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ۚ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٥ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ
رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا
بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ۭ فَلَمَّا جَاۗءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا
هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٦ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ
يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٧ يُرِيْدُوْنَ
لِيُطْفِـــُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝٨
هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ
كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝٩ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰي تِجَارَةٍ
تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝١٠ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ۝١١ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝١٢
وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ۭ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٣

(৫) স্মরণ কর, যখন মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রসূল। অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৬) স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা (আঃ) বলল ঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল ঃ এ তো এক প্রকাশ্য যাদু। (৭) যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহুত হয়েও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে ; তার চাইতে অধিক যালেম আর কে? আল্লাহ্ যালেম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৮) তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্‌র আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। (৯) তিনিই তাঁর রসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সবধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (১০) মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? (১১) তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম ; যদি তোমরা বোঝ। (১২) তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। (১৩) এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।

আগামীকালের করণীয় কাজ বর্ণনা করতে হলে ইনশাআল্লাহ্ অর্থাৎ, যদি আল্লাহ্ চান বলে বর্ণনা করবেন। বলা হয়েছেঃ وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلَّآ اَنْ يَّشَاۗءَ اللّٰهُ সাহাবা কেরামের নিয়ত ও ইচ্ছা বুলি আওড়ানো না হলেও দৃশ্যতঃ তাই বোঝা যাচ্ছিল। আল্লাহ্‌র কাছে এটা পছন্দনীয় নয় যে, কেউ কোন কাজ করার বড় গলায় দাবী করবে, ইনশাআল্লাহ্ বলা ব্যতীত। মোটকথা, তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্যে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٢ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ
اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٣

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, যে কাজ তোমরা করবে না, তা করার দাবী কর কেন? এতে এ ধরনের কাজের দাবী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বোঝা গেল, যা করার ইচ্ছাই মানুষের অন্তরে নেই। কারণ, এটা একটা মিথ্যা দাবী বৈ নয়, যা নাম ও যশ অর্জনের খাতিরে হতে পারে। বলাবাহুল্য, উপরোক্ত ঘটনায় সাহাবায়ে কেরাম যে দাবী করেছিলেন, তা না করার ইচ্ছায় ছিল না। কাজেই এটাও আয়াতের অর্থে অন্তর্ভুক্ত যে, অন্তরে ইচ্ছা ও সংকল্প থাকলেও নিজের উপর ভরসা করে কোন কাজ করার দাবী করা দাসত্বের পরিপন্থী। প্রথমতঃ তা বলারই প্রয়োজন নেই। কাজ করার সুযোগ পেলে কাজ করা উচিত। কোন উপযোগিতাবশতঃ বলার দরকার হলেও ইন্‌শাআল্লাহ্ সহ বলতে হবে। তাহলে এটা আর দাবী থাকবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পরের আয়াতে এই সূরা অবতরণের আসল কারণ বিবৃত হয়েছে ; অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ অর্থাৎ, যুদ্ধের সেই কাতার আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়, যা আল্লাহ্‌র শত্রুদের মোকাবেলায় তাঁর বাণী সমুন্নত করার জন্যে কায়েম করা হয় এবং মুজাহিদদের অসাধারণ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার কারণে তা একটি সীসা লাগানো দুর্ভেদ্য প্রাচীরের রূপ পরিগ্রহ করে।

এরপর হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ এবং শত্রুদের নির্যাতন সহ্য করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর পুনরায় মুসলমানদেরকে জেহাদ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এখানে বর্ণিত হযরত মূসা ও ঈসার (আঃ) ঘটনাবলীতেও অনেক শিক্ষাগত ও কর্মগত উপকারিতা এবং দিক নির্দেশ রয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাহিনীতে আছে যে, তিনি যখন বনী-ইসরাঈলকে তাঁর নবুওয়ত মেনে নেয়ার ও আনুগত্য করার দাওয়াত দেন, তখন বিশেষভাবে দু'টি বিষয় উল্লেখ করেন। (এক) তিনি কোন অভিনব রসূল নন এবং অভিনব বিষয় নিয়ে আগমন করেননি বরং এমনসব বিষয় নিয়ে এসেছেন, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ এ পর্যন্ত বলে এসেছেন এবং পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবে উল্লেখিত আছে। পরে যে সর্বশেষ পয়গম্বর আগমন করবেন, তিনিও এ ধরনের দিকনির্দেশ নিয়ে আসবেন।

এখানে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে তওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বনী-ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ নিকটতম কিতাব একটিই ছিল। নতুবা পয়গম্বরগণ পূর্ববর্তী সব কিতাবেরই সত্যায়ন করেছেন। এ ছাড়া এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈসা (আঃ)-এর শরীয়ত যদিও

স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু তার অধিকাংশ বিধি-বিধান মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত ও তওরাতের অনুরূপ। স্বল্পসংখ্যক বিধানই পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র।

হযরত ঈসা (আঃ) দ্বিতীয় বিষয় এই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর পরে আগমণকারী রসূলের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁর দিক নির্দেশও তদনুরূপ হবে। তাই তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও বুদ্ধি এবং সততার দাবী।

সাথে সাথে তিনি বনী ইসরাঈলকে পরে আগমনকারী রসূলের নাম-ঠিকানাও ইঞ্জীলে বলে দিয়েছেন। এভাবে বনী-ইসরাঈলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যখন আগমন করবেন, তখন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে। وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ বাক্যে তাই বর্ণিত হয়েছে। এতে সেই রসূলের নাম বলা হয়েছে আহ্‌মদ। আমাদের প্রিয় শেষনবী (সাঃ)-এর মুহাম্মদ, আহমদ এবং আরও কয়েকটি নাম ছিল। কিন্তু ইঞ্জীলে তাঁর নাম আহমদ উল্লেখ করার উপযোগিতা সম্ভবতঃ এই যে, আরবে প্রাচীনকাল থেকেই মুহাম্মদ নাম রাখার প্রচলন ছিল। ফলে এই নামের আরও লোক আরবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আহমদ নাম আরবে প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল না। এটা একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরই বিশেষ নাম ছিল।

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

এই আয়াতে ঈমান এবং ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করাকে বাণিজ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে। কারণ, বাণিজ্যে যেমন কিছু ধন-সম্পদ ও শ্রম ব্যয় করার বিনিময়ে মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ঈমান সহকারে আল্লাহ্‌র পথে জান ও মাল ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পরকালের চিরস্থায়ী নেয়ামত অর্জিত হয়। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, যে এই বাণিজ্য অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার গোনাহ্ মাফ করবেন এবং জান্নাতে উৎকৃষ্ট বাসগৃহ দান করবেন। এসব বাসগৃহে সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস-ব্যসনের সরঞ্জাম থাকবে। অতঃপর পরকালীন নেয়ামতের সাথে কিছু ইহকালীন নেয়ামতেরও ওয়াদা করা হয়েছে ঃ

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ - وَاُخْرٰى শব্দটি نِعْمَتَ এর বিশেষণ। অর্থ এই যে, পরকালীন নেয়ামত ও বাসগৃহ তো পাওয়া যাবেই ; ইহকালেও একটি নগদ নেয়ামত পাওয়া যাবে, তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অর্থাৎ, শত্রুদের বিজিত হওয়া। এখানে قَرِيْبٌ শব্দটি পরকালের বিপরীতে ধরা হলে ইসলামের সকল বিজয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যদি প্রচলিত قَرِيْبٌ ধরা হয়, তবে এর প্রথম অর্থ হবে খয়বর বিজয় এবং এরপর মক্কা বিজয়। تُحِبُّوْنَهَا অর্থাৎ, তোমরা এই নগদ নেয়ামত খুব পছন্দ কর। কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবে নগদকে পছন্দ করে। কোরআনে বলা হয়েছে। وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا অর্থাৎ, মানুষ তড়িঘড়ি পছন্দ করে। এর অর্থ এই নয় যে, পরকালীন নেয়ামত তাদের কাছে প্রিয় নয়। বরং অর্থ এই যে, পরকালের নেয়ামত তো তাদের প্রিয় কাম্যই, কিন্তু স্বভাবগতভাবে কিছু নগদ নেয়ামতও তারা দুনিয়াতে চায়। তাও দেয়া হবে।

كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ

حواريين শব্দটি حوارى এর বহুবচন। এর অর্থ আন্তরিক বন্ধু। যারা ঈসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে حوارى বলা হত। সূরা আল-ইমরানে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল বার জন। এই আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর আমলের একটি ঘটনা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে দ্বীনের সাহায্যের জন্যে তৈরী হতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) শত্রুদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিলেন ঃ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচারে কে আমার সাহায্যকারী হবে ? প্রত্যুত্তরে বার জন লোক আনুগত্যের শপথ করে এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অতএব মুসলমানদেরকেও আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচারে সাহায্যকারী হওয়া উচিত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ
لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ
اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّاۗىِٕفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّاۗىِٕفَةٌ ۚ
فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰي عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ١٤

سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ اِحْدٰى عَشْرَةَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ
الْحَكِيْمِ ١ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ
وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ ٢ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٣ ذٰلِكَ
فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ٤ مَثَلُ
الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۭ
بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظّٰلِمِيْنَ ٥ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاۗءُ لِلّٰهِ
مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ٦

(১৪) মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে-মরিয়ম তার শিষ্যবর্গকে বলেছিল, আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? শিষ্যবর্গ বলেছিল : আমরা আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনী-ইসরাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল কাফের হয়ে গেল। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুদের মোকাবেলায় শক্তি যোগালাম, ফলে তারা বিজয়ী হল।

সূরা আল-জুমুআহ

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত ১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) রাজাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে, যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে। (২) তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। (৩) এই রসূল প্রেরিত হয়েছেন অন্য আরও লোকদের জন্যে, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪) এটা আল্লাহ্‌র কৃপা, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ্ মহাকৃপাশীল। (৫) যাদেরকে তওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে। যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট। আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (৬) বলুন হে ইহুদীগণ, যদি তোমরা দাবী কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু—অন্য কোন মানব নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَاٰمَنَتْ طَّاۗىِٕفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّاۗىِٕفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا عَلٰي عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ

খ্রীষ্টানদের তিন দল : বগভী (রহঃ) এই আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, ঈসা (আঃ) আসমানে উত্থিত হওয়ার পর খ্রীষ্টান জাতি তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল বলল : তিনি খোদা ছিলেন এবং আসমানে চলে গেছেন। দ্বিতীয় দল বলল : তিনি খোদা ছিলেন না বরং খোদার পুত্র ছিলেন। এখন আল্লাহ্ তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং শত্রুদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তৃতীয় দল বিশুদ্ধ ও সত্যকথা বলল। তারা বলল : তিনি খোদাও ছিলেন না, খোদার পুত্রও ছিলেন না ; বরং আল্লাহ্‌র দাস ও রসূল ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে শত্রুদের কবল থেকে হেফাযত ও উচ্চ মর্তবা দান করার জন্যে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। তারাই ছিল সতিকার ঈমানদার। প্রত্যেক দলের সাথে কিছু কিছু জনসাধারণও যোগদান করে এবং পারস্পরিক কলহ বাড়তে বাড়তে যুদ্ধের উপক্রম হয়। ঘটনাচক্রে উভয় কাফের দল মুমিনদের মোকাবেলায় প্রবল হয়ে উঠে। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা সর্বশেষ পয়গম্বর (সাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি মুমিন দলকে সমর্থন দেন। এভাবে পরিণামে মুমিন দল যুক্তি প্রমাণের নিরীখে বিজয়ী হয়ে যায়।—(মাযহারী)

এই তফসীর অনুযায়ী اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে ঈসা (আঃ)-এর উম্মতের মুমিনগণকেই বোঝানো হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহায্য ও সমর্থনে বিজয়গৌরব অর্জন করবে।—(মাযহারী) কেউ কেউ বলেন : ঈসা (আঃ)-এর আসমানে উত্থিত হওয়ার পর খ্রীষ্টানদের মধ্যে দুইদল হয়ে যায়। একদল ঈসা (আঃ)-কে খোদা অথবা খোদার পুত্র আখ্যায়িত করে মুশরিক হয়ে যায় এবং অপরদল বিশুদ্ধও খাঁটি দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র দাস ও রসূল মান্য করে। এরপর মুশরিক ও মুমিন দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদেরকে কাফের দলের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। কিন্তু একথাই প্রসিদ্ধ যে, ঈসা (আঃ)-এর ধর্মে জেহাদ ও যুদ্ধের বিধান ছিল না। তাই মুমিন দলের যুদ্ধ করার কথা অবান্তর মনে হয়।—(রূহুল-মা'আনী) উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর জওয়াবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্ভবতঃ যুদ্ধের সূচনা কাফের খ্রীষ্টানদলের পক্ষ থেকে হয়েছিল এবং মুমিনরা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। এটা প্রকৃতপক্ষে জেহাদ ও যুদ্ধের মধ্যে পড়ে না।

সূরা আল-জুমুআহ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ কোরআন পাকের যেসব সূরা سَبَّحَ ও يُسَبِّحُ শব্দ দ্বারা শুরু হয়, সেগুলোকে 'মুসাব্বিহাত' বলা হয়। এসব সূরায় নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর জন্যে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা পাঠ সপ্রমাণ করা হয়েছে। অবস্থার মাধ্যমে এই পবিত্রতা পাঠ সবারই বোধগম্য। কারণ, সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তার প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার প্রজ্ঞা ও অপার শক্তি-সামর্থ্যের সাক্ষ্যদাতা। এটাই

তার পবিত্রতা পাঠ। নির্ভুল সত্য এই যে, প্রত্যেক বস্তু তার নিজস্ব ভঙ্গিতে আক্ষরিক অর্থেও পবিত্রতা পাঠ করে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক জড় ও অজড় পদার্থের মধ্যে তার সাধ্যানুযায়ী চেতনা ও অনুভূতি রেখেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতির অপরিহার্য দাবী হচ্ছে পবিত্রতা পাঠ। কিন্তু এসব বস্তুর পবিত্রতা পাঠ মানুষ শ্রবণ করে না। তাই কোরআনে বলা হয়েছে وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ অধিকাংশ সূরার শুরুতে অতীত পদবাচ্যে سَبَّحَ বলা হয়েছে। কেবল সূরা জুমআ ও সূরা তাগাবুনে ভবিষ্যৎ পদবাচ্যে يُسَبِّحُ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ভাষাগত অলংকার এই যে, অতীত পদবাচ্য নিশ্চয়তা বোঝায়। এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই ব্যবহৃত হয়েছে। ভবিষ্যৎ পদবাচ্য সদাসর্বদা হওয়া বোঝায়। এই অর্থ বোঝাবার জন্যে দুই জায়গায় এই পদ ব্যবহার করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا – امى শব্দটি اميين এর বহুবচন। এর অর্থ নিরক্ষর। আরবরা এই পদবীতে সুবিদিত। কারণ, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। লেখাপড়া জানা লোক খুব কম ছিল। এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার মহাশক্তি প্রকাশ করার জন্যে বিশেষভাবে আরবদের জন্যে এই পদবী অবলম্বন করা হয়েছে এবং একথাও বলা হয়েছে যে, প্রেরিত রসূলও তাদেরই একজন অর্থাৎ, নিরক্ষর। কাজেই এটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, গোটা জাতি নিরক্ষর এবং তাদের কাছে যে রসূল প্রেরিত হয়েছেন, তিনিও নিরক্ষর। অথচ যেসব কর্তব্য এই রসূলকে সোপর্দ করা হয়েছে, সেগুলো সবই এমন শিক্ষামূলক ও সংস্কারমূলক যে, কোন নিরক্ষর ব্যক্তি এগুলো শিক্ষা দিতে পারে না এবং কোন নিরক্ষর জাতি এগুলো শিখার যোগ্য নয়।

একে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তিবলে রসূলে করীম (সাঃ)–এর অলৌকিক ক্ষমতাই আখ্যা দেয়া যায় যে, তিনি যখন শিক্ষা ও সংস্কারের কাজ শুরু করেন, তখন এই নিরক্ষরদের মধ্যেই এমন সুপণ্ডিত ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটল, যাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ও কুশলতা এবং উৎকৃষ্ট কর্মপ্রতিভা সারাবিশ্বের স্বীকৃতি ও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

পয়গম্বর প্রেরণের তিন উদ্দেশ্য ঃ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ (এক) কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত, (দুই) উম্মতকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা, (তিন) কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়া।

এই তিনটি বিষয়ই উম্মতের জন্যে যেমন আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত, তেমনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যেরও অন্তর্ভুক্ত।

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ – تلاوت এর আসল অর্থ অনুসরণ করা। পরিভাষায় শব্দটি আল্লাহ্র কালাম পাঠ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। اٰيٰت বলে কোরআনের আয়াত বোঝানো হয়েছে। عَلَيْهِمْ শব্দে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে প্রেরণ করার এক উদ্দেশ্য এই যে, তিনি মানুষকে কোরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য يُزَكِّيْهِمْ এটা تزكية থেকে উদ্ভূত। অর্থ পবিত্র করা। আভ্যন্তরীণ দোষ থেকে পবিত্র করার অর্থে অধিকতর ব্যবহৃত হয় ; অর্থাৎ, কুফর, শিরক ও কুচরিত্রতা থেকে পবিত্র করা। কোন সময় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার পবিত্রতার জন্যেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এই ব্যাপক অর্থই উদ্দেশ্য।

তৃতীয় উদ্দেশ্য وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ 'কিতাব' বলে কোরআন পাক এবং 'হিকমত' বলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বর্ণিত উক্তিগত ও কর্মগত শিক্ষাসমূহ বোঝানো হয়েছে। তাই অনেক তফসীরকারক এখানে হিকমতের তফসীর করেছেন সুন্নাহ্।

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ – وَّاٰخَرِيْنَ এর শাব্দিক অন্য লোক। لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ এর অর্থ যারা এখন পর্যন্ত তাদের অর্থাৎ, নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। এখানে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে বোঝানো হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে প্রথম কাতারের মুমিন অর্থাৎ, সাহাবায়ে–কেরামের সাথে সংযুক্ত মনে করা হবে। এটা নিঃসন্দেহে পরবর্তী মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।—(রূহুল–মা'আনী)

কেউ কেউ وَّاٰخَرِيْنَ শব্দটিকে اميين এর উপর عطف করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূলকে নিরক্ষরদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন, যারা এখনও নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করার বিষয়টি বোধগম্য, কিন্তু যারা এখনও দুনিয়াতে আগমনই করেনি, তাদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করার মানে কি? বয়ানুল কোরআনে বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রেরণ করার অর্থ তাদের জন্যে প্রেরণ করা, فى শব্দটি আরবী ভাষায় এই অর্থেও আসে।

কেউ কেউ وَّاٰخَرِيْنَ শব্দের عطف মেনেছেন وَيُعَلِّمُهُمُ এর সর্বনামের উপর। এর অর্থ এই হবে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) শিক্ষা দেন নিরক্ষরদেরকে এবং তাদেরকে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি।—(মাযহারী)

সহীহ বোখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর কাছে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় সূরা জুমুআ অবতীর্ণ হয়। তিনি আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনান। তিনি وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ পাঠ করলে আমরা আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্, এরা কারা? তিনি নিরুত্তর রইলেন। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার প্রশ্ন করার পর তিনি পার্শ্বে উপবিষ্ট সালমান ফারেসী (রাঃ)–এর গায়ে হাত রাখলেন এবং বললেন ঃ যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের সমান উচ্চতায়ও থাকে, তবে তার সম্প্রদায়ের কিছুলোক সেখান থেকেও ঈমানকে নিয়ে আসবে।—(মাযহারী)

এই রেওয়ায়েতেও পারস্যবাসীদের কোন বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না ; বরং এতটুকু বোঝা যায় যে, তারাও اٰخرين অর্থাৎ, অন্য লোকদের সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত। এই হাদীসে অনারবদের যথেষ্ট ফযীলত ব্যক্ত হয়েছে।—(মাযহারী)

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا

اسفار শব্দটি سفر এর বহুবচন। এর অর্থ বড় পুস্তক। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নিরক্ষর লোকদের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর আবির্ভাব ও নবুওয়ত এবং তাঁকে প্রেরণ করার তিনটি উদ্দেশ্য যে ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, তওরাতেও তা প্রায় একই ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে দেখামাত্রই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইহুদীদের

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾
قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ
إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ
ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا
قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا
انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ
وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا
أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾

(৭) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্ জালেমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (৮) বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখামুখি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ্র কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে। (৯) মুমিনগণ, জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (১০) অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (১১) তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়। বলুন ঃ আল্লাহ্র কাছে যা আছে, তা ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

সূরা মুনাফিকূন

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রসূল। আল্লাহ্ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্র রসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (২) তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। (৩) এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। এতএব তারা বুঝে না।

উচিত ছিল। কিন্তু পার্থিব জাঁকজমক ও ধনৈশ্বর্য তাদেরকে তওরাত থেকে বিমুখ করে রেখেছে। ফলে তারা তওরাতের পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তওরাতের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ মূর্খ ও অনভিজ্ঞের পর্যায়ে চলে এসেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, যাদেরকে তওরাতের বাহক করা হয়েছিল, অর্থাৎ, অযাচিতভাবে আল্লাহ্র এই নেয়ামত দান করা হয়েছিল, তারা যথাযথভাবে একত্রে বহন করেনি ; অর্থাৎ, তারা তওরাতের নির্দেশাবলীর পরওয়া করেনি। ফলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গর্দভ, যার পিঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃহদাকার গ্রন্থ চাপিয়ে দেয়া হয়। এই গর্দভ সেই বোঝা বহন তো করে, কিন্তু তার বিষয়বস্তুর কোন খবর রাখে না এবং তাতে তার কোন উপকার হয় না। ইহুদীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তারা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্যে তওরাতকে বহন করে এবং এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জাঁকজমক ও প্রতিপত্তি লাভ করতে চায়, কিন্তু এর দিকনির্দেশ দ্বারা কোন উপকার লাভ করে না।

তফসীরবিদগণ বলেন ঃ যে আলেম তার এলম অনুযায়ী আমল করে না, তার দৃষ্টান্তও ইহুদীদের অনুরূপ।

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا ... إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ইহুদীরা তাদের কুফর, শিরক ও চরিত্রহীনতা সত্ত্বেও দাবী করত যে, نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ অর্থাৎ, আমরা তো আল্লাহ্র সন্তান সন্ততি ও প্রিয়জন। তারা নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে জান্নাতের যোগ্য অধিকারী মনে করত না ; বরং তাদের বক্তব্য ছিল ঃ

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا অর্থাৎ, ইহুদী না হয়ে কেউ জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না। তারা যেন নিজেদেরকে পরকালের শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মনে করত এবং জান্নাতের নেয়ামতসমূহকে তাদের ব্যক্তিগত জায়গীর মনে করত। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, পরকালের নেয়ামতসমূহ ইহকালের নেয়ামত অপেক্ষা হাজারো গুণে শ্রেষ্ঠ এবং সে আরও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পরই সে এসব মহান ও চিরন্তন নেয়ামত অবশ্যই লাভ করবে, তার মধ্যে সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধি থাকলে সে অবশ্যই মনে-প্রাণে মৃত্যু কামনা করবে। তার আন্তরিক বাসনা হবে যে, মৃত্যু শীঘ্রই আসুক, যাতে সে দুনিয়ার মলিন ও দুঃখ-বিষাদের পূর্ণ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে অকৃত্রিম সুখ ও শান্তির চিরকালীন জীবনে প্রবেশ করতে পারে।

তাই আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ আপনি ইহুদীদের বলুন, যদি তোমরা দাবী কর যে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একমাত্র তোমরাই আল্লাহ্র বন্ধু ও প্রিয়পাত্র এবং পরকালের আযাব সম্পর্কে তোমরা মোটেই কোন আশংকা না কর, তবে জ্ঞান-বুদ্ধির দাবী এই যে, তোমরা মৃত্যু কামনা কর এবং মৃত্যুর জন্যে আগ্রহান্বিত থাক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এরপর কোরআন নিজেই বলে ঃ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ অর্থাৎ, তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। কারণ, তারা পরকালের জন্যে কুফর, শিরক ও কুকর্ম ব্যতীত আর কিছুই পায়নি। অতএব তারা ভালরূপে জানে যে, পরকালে তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিই অবধারিত রয়েছে। তারা আল্লাহ্র প্রিয়জন হওয়ার যে দাবী করে, তা

সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা স্বয়ং তাদের অজানা নেই। তবে দুনিয়ার উপকারিতা লাভ করার জন্যে তারা এ ধরনের দাবী করে। তারা আরও জানে যে, যদি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কথায় তারা মৃত্যু কামনা করে তবে তা অবশ্যই কবুল হবে এবং তারা মরে যাবে। তাই বলা হয়েছে, ইহুদীরা মৃত্যু কামনা করতেই পারে না।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যদি সে সময় তাদের কেউ মৃত্যু কামনা করত, তবে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হত।—(রূহুল-মা'আনী)

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ অর্থাৎ, ইহুদীরা উপরোক্ত দাবী সত্ত্বেও মৃত্যু কামনা থেকে বিরত থাকত। এর সারমর্ম মৃত্যু থেকে পলায়ন করা বৈ নয়। অতএব আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর, তা অবশ্যই আসবে। আজ নয় তো কিছুদিন পর। সুতরাং মৃত্যু থেকে পলায়ন সম্পূর্ণতঃ কারও সাধ্যে নেই।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ - يَوْمِ الْجُمُعَةِ এই দিনটি মুসলমানদের সমাবেশের দিন। তাই এই দিনকে 'ইয়াওমুল জুমআ' বলা হয়। আল্লাহ্ তাআলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও সমস্ত জগতকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। এই ছয়দিনের শেষদিন ছিল জুমআর দিন। এই দিনেই আদম (আঃ) সৃজিত হন, এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে দাখিল করা হয় এবং এই দিনেই জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামানো হয়। কেয়ামত এই দিনেই সংঘটিত হবে। এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আসে, যাতে মানুষ যে দোয়াই করে, তাই কবুল হয়। এসব বিষয় সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে।—(ইবনে-কাসীর)

আল্লাহ্ তাআলা প্রতি সপ্তাহে মানবজাতির সমাবেশ ও ঈদের জন্যে এই দিন রেখেছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতরা তা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ইহুদীরা 'ইয়াওমুস সাবত' তথা শনিবারকে নিজেদের সমাবেশের দিন নির্ধারিত করে নেয় এবং খ্রীষ্টানরা রবিবারকে। আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতকেই তওফীক দিয়েছেন যে, তারা শুক্রবারকে মনোনীত করেছে।—(ইবনে-কাসীর) মুর্খতাযুগে শুক্রবারকে 'ইয়াওমে আরূবা' বলা হত। আরবে কা'ব ইবনে লুয়াই সর্বপ্রথম এর নাম 'ইয়াওমুল জুমআ' রাখেন। এই দিনে কোরাইশদের সমাবেশ হত এবং কাব ইবনে লুয়াই ভাষণ দিতেন। এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পাঁচশত ষাট বছর পূর্বের ঘটনা।

কা'ব ইবনে লুয়াই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পূর্বপুরুষদের অন্যতম। আল্লাহ্ তাআলা মুর্খতাযুগেও তাকে প্রতিমা পূজা থেকে রক্ষা করেন এবং একত্ববাদের বিশ্বাস রাখার তওফীক দান করেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদও মানুষকে শুনিয়েছিলেন। কোরাইশ গোত্র তাঁকে একজন মহান ব্যক্তি হিসেবে সম্মান করত। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নবুওয়ত লাভের পাঁচশত ষাট বছর পূর্বে যেদিন তাঁর মৃত্যু হয়, সেদিন থেকেই কোরাইশরা তাদের বছর গণনা শুরু করে। শুরুতে কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন থেকে আরবদের বছর গণনা আরম্ভ করা হত। কা'ব ইবনে লুয়াই – এর মৃত্যুর পর তাঁর মৃত্যুদিবস থেকেই বছর গণনা প্রচলিত হয়ে যায়। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্মের বছর যখন হস্তিবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন এদিন থেকেই তারিখ গণনা আরম্ভ হয়। সারকথা এই যে, ইসলাম পূর্বকালেও কা'ব ইবনে লুয়াই -এর আমলে শুক্রবার দিনকে গুরুত্ব দান করা হত। তিনিই এই দিনের নাম জুমআর দিন রেখেছিলেন।—(মাযহারী)

نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ - نداء صلوة বলে আযান বোঝানো হয়েছে। سعى শব্দের এক অর্থ দৌড়া এবং অপর অর্থ কোন কাজ গুরুত্ব সহকারে করা। এখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য। কারণ, নামাযের জন্যে দৌড়ে আসতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ শান্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে নামাযের জন্যে গমন কর। আয়াতের অর্থ এই যে, জুমআর দিনে জুমআর আযান দেয়া হলে আল্লাহ্র যিকেরের দিকে ত্বরা কর। অর্থাৎ নামায ও খোতবার জন্যে মসজিদে যেতে যত্নবান হও। যে ব্যক্তি দৌড় দেয়, সে অন্য কোন কাজের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তোমরাও তেমনি আযানের পর নামায ও খোতবা ব্যতীত অন্য কাজের দিকে মনোযোগ দিও না।—(ইবনে-কাসীর) ذِكْرِ اللَّهِ বলে জুমআর নামায এবং এই নামাযের অন্যতম শর্ত খোতবাও বোঝানো হয়েছে।—(মাযহারী)

وَذَرُوا الْبَيْعَ অর্থাৎ, বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এতে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, জুমআর আযানের পর বেচাকেনা হারাম করা হয়েছে। এই আদেশ পালন করা বিক্রেতা ও ক্রেতা সবার উপর ফরয। বলাবাহুল্য, দোকানপাট বন্ধ করে দিলেই ক্রয়-বিক্রয় আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

পূর্বের আয়াতসমূহে জুমআর আযানের পর বেচাকেনা ইত্যাদি পার্থিব কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই আয়াতে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, জুমআর নামায সমাপ্ত হলে ব্যবসায়িক কাজকর্ম এবং রিযিক হাসিলের চেষ্টা সবাই করতে পারে।

وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ এই আয়াতে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে, যারা জুমআর খোতবা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়িক কাজ-কারবারে মনোযোগ দিয়েছিল। ইবনে-কাসীর বলেন ঃ এই ঘটনা তখনকার, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জুমআর নামাযের পর জুমআর খোতবা পাঠ করতেন। দুই ঈদের নামাযে অদ্যাবদি এই নিয়ম প্রচলিত আছে। এক জুমআর দিনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নামাযান্তে খোতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মদীনার বাজারে উপস্থিত হয় এবং ঢোল ইত্যাদি পিটিয়ে তা ঘোষণা করা হয়। ফলে অনেক মুসল্লী খোতবা ছেড়ে বাজারে চলে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বল্পসংখ্যক সাহাবীসহ মসজিদে থেকে যান। তাদের সংখ্যা বার জন বর্ণিত আছে।—(আবু দাউদ) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বললেন ঃ যদি তোমরা সবাই চলে যেতে, তবে মদীনার উপত্যকা আযাবের অগ্নিতে পূর্ণ হয়ে যেত।—(ইবনে-কাসীর)

তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন, এই বাণিজ্যিক কাফেলাটি ছিল দেহইয়া ইবনে খলফ কলবীর। সে সিরিয়া থেকে মাল-সম্ভার নিয়ে এসেছিল। তার কাফেলায় সাধারণতঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছু থাকত। তার আগমনের সংবাদ পেলে মদীনার নারী-পুরুষ সবাই দৌড়ে কাফেলার কাছে যেত। দেহইয়া ইবনে খলফ তখন পর্যন্ত মুসলমান ছিল না ; পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

হাসান বসরী ও আবু মালেক (রহঃ) বলেন ঃ এই কাফেলার আগমনের

সময় মদীনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল।—(মাযহারী) এসব কারণেই বিপুলসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম বাণিজ্যিক কাফেলার আওয়ায শুনে মসজিদ থেকে বের হয়ে যান। ফরয নামায শেষ হয়ে গিয়েছিল। জানা ছিল না যে, এটা শ্রবণ করা অপরিহার্য। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য এবং তৃতীয়তঃ বাণিজ্যিক কাফেলার উপর সবার ঝাঁপিয়ে পড়া—এসব কারণে তাঁরা মনে করেছিলেন যে, দেরীতে গেলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়া যাবে না।

এসব কারণেই সাহাবায়ে কেরামের পদস্খলন হয় এবং উল্লেখিত হাদীসে তাঁদের প্রতি সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়। এ ব্যাপারে তাদেরকে লজ্জা দেয়া ও হুশিয়ার করার জন্যে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিয়ম পরিবর্তন করে জুমআর নামাযের পূর্বে খোতবা দেয়া শুরু করেন। বর্তমান তাই সুন্নত।—(ইবনে-কাসীর)

আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে একথা বলে দিতে আদেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র কাছে যে সওয়াব আছে, তা এই বাণিজ্য থেকে উত্তম। এটাও অবান্তর নয় যে, যারা নামায ও খোতবার খাতিরে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেয়, তাদের জন্যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দুনিয়াতেও বিশেষ বরকত নাযিল হবে।

সূরা আল-মুনাফিক্বুন

সূরা মুনাফিক্বুন অবতরণের বিস্তারিত ঘটনা ঃ এই ঘটনা মুহাম্মদ ইবনে-ইসহাক (রহঃ)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ষষ্ঠ হিজরীতে এবং কাতাদাহ ও ওরওয়া (রহঃ)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী পঞ্চম হিজরীতে 'বনিল-মুস্তালিক' যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়।—(মাযহারী) ঘটনা এই ঃ রসূললুল্লাহ্ (সাঃ) সংবাদ পান যে, 'মুস্তালিক' গোত্রের সরদার হারেস ইবনে যেরার তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই হারেস ইবনে যেরার হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ)-এর পিতা, যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিবিদের অন্তর্ভুক্ত হন। হারেস ইবনে যেরারও পরে মুসলমান হয়ে যায়।

সংবাদ পেয়ে রসূলে করীম (রাঃ) একদল মুজাহিদসহ তাদের মোকাবেলা করার জন্যে বের হন। এই জেহাদে গমনকারী মুসলমানদের সঙ্গে অনেক মুনাফিকও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার হওয়ার লোভে রওয়ানা হয়। কারণ, তারা অন্তরে কাফের হলেও বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ্র সাহায্যে তিনি এই যুদ্ধে বিজয়ী হবেন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মুস্তালিক গোত্রে পৌছলেন, তখন 'মুরাইসী' নামে খ্যাত একটি কূপের কাছে হারেস ইবনে যেরারের বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। এ কারণেই এই যুদ্ধকে মুরাইসী যুদ্ধও বলা হয়। উভয়পক্ষ সারিবদ্ধ হয়ে তীর বর্ষণের মাধ্যমে মোকাবেলা হল। মুস্তালিক গোত্রের বহুলোক হতাহত হল এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করতে লাগল। আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বিজয় দান করলেন। প্রতিপক্ষের কিছু ধন-সম্পদ এবং কয়েকজন পুরুষ ও নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হল। এভাবে এই জেহাদের সমাপ্তি ঘটল।

এরপর যখন মুসলমান মুজাহিদ বাহিনী মুরাইসী কূপের কাছেই সমবেত ছিল, তখন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। একজন মুহাজির ও একজন আনসারীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে হাতাহাতির সীমা অতিক্রম করে পারস্পরিক সংঘর্ষের পর্যায়ে পৌছে গেল। মুহাজির ব্যক্তি সাহায্যের জন্যে মুহাজিরগণকে এবং আনসারী ব্যক্তি আনসার সম্প্রদায়কে ডাক দিল। উভয়ের সাহায্যার্থে কিছু লোক তৎপরও হয়ে উঠল। এভাবে ব্যাপারটি মুসলমানদের পারস্পরিক সংঘর্ষের কাছাকাছি পৌছে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সংবাদ পেয়ে অনতিবিলম্বে অকুস্থলে পৌছে গেলেন এবং ভীষণ রুষ্ট হয়ে বললেন ঃ ما بال دعوى الجاهلية অর্থাৎ, এ কি মূর্খতাযুগের আহবান। দেশ ও বংশগত জাতীয়তাকে ভিত্তি করে সাহায্য ও সহযোগিতার আয়োজন হচ্ছে কেন? তিনি আরও বললেন ঃ دعوها فانها منتنة এই শ্লোগান বন্ধ কর। এটা দুর্গন্ধময় শ্লোগান। তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অপর মুসলমানের সাহায্য করা—সে যালেম হোক অথবা মযলুম। মযলুমকে সাহায্য করার অর্থ তো জানাই যে, তাকে যুলুম থেকে রক্ষা করা। জালেমকে সাহায্য করার অর্থ তাকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করা। এটাই তার প্রকৃত সাহায্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যাপারে দেখা উচিত কে যালেম ও কে মযলুম। এরপর মুহাজির, আনসারী, গোত্র ও বংশ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য মজলুমকে জুলুম থেকে রক্ষা করা এবং জালেমের হাত চেপে ধরা—সে আপন সহোদর ভাই হোক অথবা পিতা হোক। এই দেশ ও বংশগত জাতীয়তা একটা মূর্খতাসুলভ দুর্গন্ধময় শ্লোগান। এর ফল জঞ্জাল বাড়ানো ছাড়া কিছুই হয় না।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই উপদেশবাণী শোনামাত্রই ঝগড়া মিটে গেল। এ ব্যাপারে মুহাজির জাহ্জাহের বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হল। তার হাতে সিনান ইবনে ওবরা আনসারী (রাঃ) আহত হয়েছিলেন। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে ঝগড়াকারী জালেম ও মজলুম উভয়ই পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেল।

মুনাফিকদের যে দলটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লালসায় মুসলমানদের সাথে আগমন করেছিল। তাদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই যখন মুহাজির ও আনসারীর পারস্পরিক সংঘর্ষের খবর পেল, তখন সে একে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিল। সে মুনাফিকদের এক মজলিসে, যাতে মুমিনদের মধ্যে কেবল যায়েদ ইবনে আরকাম উপস্থিত ছিলেন, আনসারকে মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশে বলল ঃ তোমরা মুহাজিরদেরকে দেশে ডেকে এনে মাথায় চড়িয়েছ, নিজেদের ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত হয়ে এখন তোমাদেরই ঘাড় মটকাচ্ছে। যদি তোমাদের এখনও জ্ঞান ফিরে না আসে, তবে পরিণামে এরা তোমাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে টাকা-পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করো না। এতে তারা আপনা-আপনি ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্মানীরা বহিরাগত এসব বাজে লোকদের বহিষ্কার করে দিবে।

সম্মানী বলে তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দল ও আনসার এবং বাজে লোক বলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) একথা শোনা মাত্রই বলে উঠলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, তুই-ই বাজেলোক লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তিবলে এবং মুসলমানদের ভালবাসার জোরে মহাসম্মানী।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে, বিপদ দেখলে সে, তার কপটতার উপর পর্দা ফেলে দিবে। তাই সে স্পষ্টভাষা ব্যবহার করেনি। কিন্তু যায়েদ ইবনে আকরামের ক্রোধ দেখে তার সম্বিৎ ফিরে এল। পাছে তার কুফর প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই আশংকায় সে হযরত যায়েদের কাছে

ওযর পেশ করে বলল ঃ আমি তো একথাটি হাসির ছলে বলেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কিছু করা ছিল না।

যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) মজলিস থেকে উঠে সোজা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে গেলেন এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা তাঁকে বলে শোনালেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে সংবাদটি খুবই গুরুতর মনে হল। মুখমণ্ডলে পরিবর্তনের রেখা ফুটে উঠল। যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) অল্পবয়স্ক সাহাবী ছিলেন রসূল (সাঃ) তাকে বললেন ঃ বৎস দেখ, তুমি মিথ্যা বলছ না তো? যায়েদ কসম খেয়ে বললেন ঃ না, আমি নিজ কানে এসব কথা শুনেছি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবার বললেন ঃ তোমার কোনরূপ বিভ্রান্তি হয়নি তো? যায়েদ উত্তরে পূর্বের কথাই বললেন। এরপর মুনাফিক সরদারের এই কথা গোটা মুসলমান বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে এছাড়া আর কোন আলোচনাই রইল না। এদিকে সব আনসার যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-কে তিরস্কার করতে লাগলেন যে, তুমি সম্প্রদায়ের নেতার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছ। যায়েদ (রাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, সমগ্র খাযরাজ গোত্রের মধ্যে আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই অপেক্ষা অধিক প্রিয় কেউ নেই। কিন্তু যখন সে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার পিতাও এমন কথা বলত তবে আমি তাও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গোচরীভূত করতাম।

অপরদিকে হযরত ওমর (রাঃ) এসে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে হযরত ওমর (রাঃ) এ কথা বলেছিলেন ঃ আপনি ওব্বাদ ইবনে বিশরকে আদেশ করুন, সে তার মস্তক কেটে আপনার সামনে উপস্থিত করুক।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ ওমর, এর কি প্রতিকার যে, মানুষের মধ্যে খ্যাত হয়ে যাবে আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। অতঃপর তিনি ইবনে উবাইকে হত্যা করতে বারণ করে দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর এই কথা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এর পুত্র জানতে পারলেন। তাঁর নামও আবদুল্লাহ্ ছিল। তিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ যদি আপনি আমার পিতাকে এসব কথাবার্তার কারণে হত্যা করবার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমাকে আদেশ করুন, আমি তার মস্তক কেটে আপনার কাছে এই মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে হাযির করব। তিনি আরও আরয করলেন ঃ সমগ্র খাযরাজ গোত্র সাক্ষী, তাদের মধ্যে কেউ আমা অপেক্ষা অধিক পিতামতার সেবা ও আনুগত্যকারী নেই। কিন্তু আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধে তাদেরও কোন বিষয় সহ্য করতে পারব না। আমার আশংকা যে, আপনি যদি অন্য কাউকে আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ দান এবং সে তাকে হত্যা করে, তবে আমি আমার পিতৃহন্তাকে চোখের সামনে চলা-ফেরা করতে দেখে হয়ত আত্মসম্বরন করতে পারবনা। এটা আমার জন্য আযাবের কারণ হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার নেই এবং আমি কাউকে এ বিষয়ে আদেশও করিনি।

এই ঘটনার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাধারন অভ্যাসের বিপরীতে অসময়ের সফর শুরু করার কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং নিজে 'কসওয়া' উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সাহাবায়ে কেরাম রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে .উবাইকে ডেকে এনে বললেন ঃ তুমি কি বাস্তবিকই এরূপ কথা বলেছ? সে অনেক কসম খেয়ে বলল ঃ আমি কখনও এরূপ কথা বলিনি। এই বালক (যায়েদ ইবনে আরকাম) মিথ্যাবাদী। স্বগোত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তারা সবাই স্থির করল যে, সম্ভবত ঃ যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) ভুল বুঝেছে। আসলে ইবনে উবাই একথা বলেনি।

মোটকথা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইবনে উবাইয়ের কসম ও ওযর কবুল করে নিলেন। এদিকে জনগণের মধ্যে যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও তিরস্কার আরও তীব্র হয়ে গেল। তিনি এই অপমানের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সমগ্র মুজহিদ বাহিনীসহ সারাদিন ও সারারাত সফর করলেন এবং পরের দিন সকালেও সফর অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে যখন সূর্যকিরণ প্রখর হতে লাগল, তখন তিনি কাফেলাকে একজায়গায় থামিয়ে দিলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফরের ফলে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত সাহাবায়ে কেরাম মনযিলে অবস্থানের সাথে সাথে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন ঃ সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাৎক্ষণিক ও অসময়ে সফর করা এবং সুদীর্ঘকাল সফর অব্যাহত রাখার পিছনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা থেকে উদ্ভূত জল্পনা-কল্পনা হতে মুজাহিদদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেয়া, যাতে এ সম্পর্কিত চর্চার অবসান ঘটে।

এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পুনরায় সফর শুরু করলেন। ইতিমধ্যে ওবাদা ইবেন সামেত (রাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে উপদেশচ্ছলে বললেন ঃ তুমি এক কাজ কর। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নাও। তিনি তোমার জন্যে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। এতে তোমরা মুক্তি হয়ে যেতে পারে। ইবনে উবাই এই উপদেশ শুনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। হযতর ওবাদা (রাঃ) তখনই বললেন ঃ আমার মনে হয়, তোমর এই বিমুখতা সম্পর্কে অবশ্যই কোরআনের আয়াত নাযিল হবে।

এদিকে সফর চলাকালে যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বার বার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আসতেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। অতএব আমার সত্যায়ন ও এই ব্যক্তির মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কোরআন নাযিল হবে। হঠাৎ যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) দেখলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মধ্যে ওহী অবতরণকালীন লক্ষণাদি ফুটে উঠছে। তাঁর শ্বাস ফুলে উঠছে, কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তাঁর উষ্ট্রী বোঝার ভারে নুয়ে পড়ছে। যায়েদ (রাঃ) আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোন ওহী নাযিল হবে। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এই অবস্থা দুর হয়ে গেল। যায়েদ (রাঃ) বলেন ঃ আমার সওয়ারী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছ ঘেঁষে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকেই আমার কান ধরলেন এবং বললেন ঃ

يا غلام صدق الله حديثك ونزلت سورة المنافقين فى ابن ابى من اولها الى اخرها ـ

অর্থাৎ, হে বালক, আল্লাহ্ তাআলা তোমরা কথার সত্যায়ন করেছেন এবং সম্পূর্ণ সূরা মুনাফিকূন ইবনে উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, সূরা মুনাফিকূন সফরের মধ্যেতই নাযিল হয়েছে। কিন্তু বগভী (রহঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মদীনায় পৌঁছে যান এবং যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) অপমানের ভয়ে গৃহে আত্মগোপন করেন, তখন এই সূরা নাযিল

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ
خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ
قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ
اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ سَوَاءٌ
عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا
عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا
إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ
قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ
نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

(৪) আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শুনেন। তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ্য। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহ্ তাদেরকে। তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে? (৫) যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমরা এস, আল্লাহ্র রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) আপনি তাদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ্ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৭) তারাই বলে ঃ আল্লাহ্র রসূলের সাহচর্যে যারা আছে তাদের জন্যে ব্যয় করো না। পরিণামে তারা আপনা-আপনি সরে যাবে। ভূ ও নভোমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্রই কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না। (৮) তারা বলে ঃ আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। শক্তি তো আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মুমিনদের ই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না। (৯) মুমিনগণ। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (১০) আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (১১) প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন।

হয়েছে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মদীনার নিকটবর্তী আকীক উপত্যকায় পৌঁছেন, তখন ইবনে উবাইয়ের মুমিন পুত্র আবদুল্লাহ্ (রাঃ) সম্মুখে অগ্রসর হন এবং খুঁজতে খুঁজতে পিতা ইবনে উবাইয়ের কাছে পৌঁছে তার উষ্ট্রীকে বসিয়ে দেন। তিনি উষ্ট্রীর হাঁটুতে পা রেখে পিতাকে বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত সম্মানী বাজে লোককে বহিষ্কৃত করবে'—এ কথার ব্যাখ্যা না কর। এই বাক্যে সম্মানী কে?– রসূলুল্লাহ্ (সাঃ), না তুমি? পুত্র পিতার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল এবং যারা এ পথ অতিক্রম করছিল তারা পুত্র আবদুল্লাহ্কে তিরস্কার করছিল যে, পিতার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করছ কেন? অবশেষে যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উষ্ট্রী তাদের কাছে আসল, তখন তিনি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল ঃ আবদুল্লাহ্ এই বলে তার পিতার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দেখলেন যে, মুনাফিক ইবনে উবাই বেগতিক হয়ে পুত্রের কাছে বলে যাচ্ছে ঃ আমি তো ছেলেপিলে ও নারীদের চাইতেও অধিক লাঞ্ছিত। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পুত্রকে বললেন ঃ তার পথ ছেড়ে দাও, তাকে মদীনায় যেতে দাও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মুনাফিকূন অবতরণের পটভূমি এতটুকুই। এই কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে একথাও বলা হয়েছে যে, বনিল-মুস্তালিক যুদ্ধের জন্যে আসলে উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ)-এর পিতা হারেস ইবনে যেরার দায়ী ছিলেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তাআলা হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ)-কে ইসলাম গ্রহণ এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পত্নী হওয়ার গৌরব দান করেন। তাঁর পিতা হারেসও পরে মুসলমান হয়ে যান।

এ ঘটনা মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ ইত্যাদি কিতাবে এভাবে বর্ণিত আছে যে, মুস্তালিক গোত্র পরাজিত হলে তাদের কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দীও মুসলমানদের করতলগত হয়। ইসলামী আইন অনুযায়ী সব কয়েদী ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুজাহিদগণের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। কয়েদীদের মধ্যে হারেস ইবনে যেরারের কন্যা জুয়ায়রিয়াও ছিলেন। তিনি সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ)-এর ভাগে পড়েন। সাবেত (রাঃ) জুয়ায়রিয়াকে কিতাবতের প্রথায় মুক্ত করে দিতে চাইলেন। এর অর্থ এই যে, দাস অথবা দাসী মেহনত-মজুরী করে অথবা ব্যবসায়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে মালিককে দিলে সে মুক্ত হয়ে যেত।

জুয়ায়রিয়ার যিম্মায় মোটা অংকের অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা পরিশোধ করা সহজসাধ্য ছিল না। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন ঃ আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ এক তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রসূল। অতঃপর নিজের ঘটনা শুনালেন যে, সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ) আমার সাথে কিতাবতের চুক্তি করেছে। কিন্তু কিতাবতের অর্থ পরিশোধ করার সাধ্য আমার নেই। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু সাহায্য করুন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং সাথে সাথে তাঁকে মুক্ত করে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জুয়ায়রিয়ার জন্যে এর চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারত! তিনি সানন্দে প্রস্তাব মেনে নিলেন।

এইভাবে তিনি পুণ্যময়ী বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। উম্মুল-মুমিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বনিল-মুস্তালিক যুদ্ধে গমনের তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, ইয়াসরিবের (মদীনার) দিক থেকে চাঁদ রওয়ানা হয়ে আমার কোলে এসে লুটিয়ে পড়েছেন। তখন আমি এই স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করিনি। কিন্তু এখন তার ব্যাখ্যা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

তিনি ছিলেন গোত্রপতির কন্যা। তিনি যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পুণ্যময়ী বিবিদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন, তখন এর শুভ প্রতিক্রিয়া তাঁর গোত্রের উপরও প্রতিফলিত হয়। তাঁর সাথে বন্দিনী অন্যান্য নারীরাও এই শুভবিবাহের উপকারিতা লাভ করল। কেননা এই বিবাহের কথা জানাজানি হওয়ার পর যে যে মুসলমানের কাছে তাঁর আত্মীয় কোন বন্দিনী ছিল, তারা সবাই তাদেরকে মুক্ত করে দিল। এভাবে একশ' বন্দিনী তাঁর সাথে মুক্ত হয়ে গেল। এপর তাঁর পিতাও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি মোজেযা দেখে মুসলমান হয়ে গেলেন।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে সূরা মুনাফিকূন নাযিল হয়েছে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার কসম সবই মিথ্যা। এই মুনাফিক সরদারের হিতাকাঙ্খায় কেউ কেউ তাকে বলল ঃ তুই জানিস কোরআনে তোর সম্পর্কে কি নাযিল হয়েছে? এখনও সময় আছে, তুই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে হাযির হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তোর জন্যে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। সে উত্তরে বলল ঃ তোমরা আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছিলে, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এরপর তোমরা আমাকে অর্থ-সম্পদের যাকাত দিতে বলেছিলে, আমি তাও দিতেছি। এখন আর কি বাকী রইল? আমি কি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সেজদা করব? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যখন তার অন্তরে ঈমানই নেই, তখন তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা উপকারী হতে পারে না।

এই ঘটনার পর ইবনে উবাই মদীনায় পৌছে বেশীদিন জীবিত থাকেনি—শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।—(মাযহারী)

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا

জাহ্জাহ্ মুহাজির ও সিনান আনসারীর ঝগড়ার সময় ইবনে উবাই-ই একথা বলেছিল। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, নির্বোধরা মনে করে মুহাজিরগণ তাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী এবং ওরাই তাদের অন্ন যোগায়। অথচ সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্র হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে মুহাজিরগণকে তোমাদের কোন সাহায্য ছাড়াই সবকিছু দিতে পারেন। ইবনে উবাইয়ের এরূপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা ও বোকামীর পরিচায়ক। তাই কোরআন পাক এস্থলে لَا يَفْقَهُونَ বলে ব্যক্ত করেছে যে, যে এরূপ মনে করে, সে বেওকুফ ও নির্বোধ।

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

এটাও ইবনে উবাইয়ের উক্তি। এই উক্তির ভাষা অস্পষ্ট হলেও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ছিল না যে, সে নিজেকে এবং মদীনার আনসারগণকে শক্তিশালী ও ইযযতদার এবং এর বিপরীতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুহাজির সাহাবায়ে-কেরামকে দুর্বল ও হেয় বলে প্রকাশ করেছিল। সে মদীনার আনসারগণকে উত্তেজিত করেছিল, যাতে তারা এই দুর্বল ও 'হেয়' লোকদেরকে মদীনা থকে বহিষ্কৃত করে দেয়। আল্লাহ্ তাআলা এর জওয়াবে তার কথা তারই দিকে উল্টে দিয়েছেন যে, যদি ইযযতওয়ালারা 'হেয়' লোকদেরকে বের করেই দেয়, তবে এর কুফল তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কেননা, ইযযত তো আল্লাহ্র, তাঁর রসূলের এবং মুমিনদের প্রাপ্য। কিন্তু মূর্খতার কারণে তোমরা এ সম্পর্কে বে-খবর। এখানে কোরআন لَا يَعْلَمُونَ এবং এর আগে لَا يَفْقَهُونَ শব্দ ব্যবহার করেছে। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, কোন মানুষ নিজেকে অন্যের রিযিকদাতা মনে করলে এটা নিরেট জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপন্থী এবং নির্বুদ্ধিতার আলামত। পক্ষান্তরে ইযযত ও অপমান দুনিয়াতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনে লাভ করে। তাই এতে বিভ্রান্তি হলে সেটা বোধবর ও অনভিজ্ঞ হওয়ার প্রমাণ। তাই এখানে لَا يَعْلَمُونَ বলা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ এই সূরার প্রথম রুকূতে মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছিল। দুনিয়ার মহব্বতে পরাভূত হওয়াই ছিল এসব কিছুর সারমর্ম। এ কারণেই তারা একদিকে মুসলমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষা এবং অপরদিকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ভাগ বসাবার উদ্দেশে বাহ্যতঃ নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত। মুহাজির সাহাবীদের পিছনে ব্যয় করার ধারা বন্ধ করার যে চক্রান্ত তারা করেছিল, এর পশ্চাতেও এ কারণই নিহিত ছিল। এই দ্বিতীয় রুকূতে খাঁটি মুমিনদেরকে সম্বোধন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের ন্যায় দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে যেয়ো না। যেসব বিষয় মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ থেকে গাফেল করে, তন্মধ্যে দু'টি সর্ববৃহৎ-ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই এই দু'টির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-সম্ভারই উদ্দেশ্য। আয়াতের সারমর্ম এই যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় নয়। বরং এগুলো নিয়ে ব্যাপৃত থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েযই নয়—ওয়াজিবও হয়ে যায়। কিন্তু সর্বদা এই সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। এখানে 'আল্লাহ্র স্মরণের' অর্থ কোন কোন তফসীরবিদের মতে পাঞ্জেগানা নামায, কারও মতে হজ্ব ও যাকাত এবং কারও মতে কোরআন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ স্মরণের অর্থ এখানে যাবতীয় আনুগত্য ও এবাদত। এই অর্থ সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত।—(কুরতুবী)

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ এই আয়াতে মৃত্যু আসার অর্থ মৃত্যুর লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর লক্ষণাদি সামনে আসার আগেই স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট থাকা অবস্থায় তোমাদের ধনসম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে পরকালের পুঁজি করে নাও। নতুবা মৃত্যুর পর এই ধন-সম্পদ তোমাদের কোন কাজে আসবে না। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আল্লাহ্র স্মরনের' অর্থ যাবতীয় এবাদত ও শরীয়তের আদেশ-নিষেধ পালন করা। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর এখানে অর্থ ব্যয় করাকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার দু'টি কারণ হতে পারে। (এক) আল্লাহ্ ও তাঁর আদেশ নিষেধ পালনে মানুষকে গাফেলকারী সর্ববৃহৎ বস্তু হচ্ছে ধন-সম্পদ। তাই যাকাত, ওশর, হজ্ব ইত্যাদি আর্থিক এবাদত স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। (দুই) মৃত্যুর লক্ষণাদি দৃষ্টির সামনে আসার সময় কারও সাধ্য নেই এবং কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, কাযা নামাযগুলো পড়ে নেবে, কাযা হজ্ব

سورة التغابن مدنية وهي ثماني عشرة آية وفيها ركوعان

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ ۡ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝١ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ
فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٢
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ
وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٣ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ
مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢبِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٤
اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۡ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٥ ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۡ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى
اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ۝٦ زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ
يُّبْعَثُوْا ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا
عَمِلْتُمْ ۚ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝٧ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَالنُّوْرِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٨

সূরা আত-তাগাবুন

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (২) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (৩) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন। (৪) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তিনি তা জানেন। তিনি আরও জানেন তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর। আল্লাহ্ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (৫) তোমাদের পূর্বে যারা কাফের ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬) এটা এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীসহ আগমন করলে তারা বলত ঃ মানুষই কি আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করবে? অতঃপর তারা কাফের হয়ে গেল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। এতে আল্লাহ্‌র কিছু আসে যায় না। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী প্রশংসার্হ। (৭) কাফেররা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। (৮) অতএব তোমরা আল্লাহ্ তাঁর রসূল এবং অবতীর্ণ নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

আদায় করবে অথবা কাযা রোযা রাখবে, কিন্তু ধন-সম্পদ সামনে থাকে এবং এ বিশ্বাস হয়েই যায় যে, এখন এই ধন তার হাত থেকে চলে যাবে। তখনও তাড়াতাড়ি ধন-সম্পদ ব্যয় করে আর্থিক এবাদতের ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়া দান-খয়রাত যাবতীয় আপদ-বিপদ দুর করার ব্যাপারেও কার্যকর।

সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল ঃ কোন্ সদকায় সর্বাধিক সওয়াব পাওয়া যায়? তিনি বললেন ঃ যে সদকা সুস্থ অবস্থায় এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে—অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজেই দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকা অবস্থায় করা হয়। তিনি আরও বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করো না যখন আত্মা তোমার কণ্ঠনালীতে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাক আর বল ঃ এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে ব্যয় কর।

فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, যে ব্যক্তির যিম্মায় যাকাত ফরয ছিল; কিন্তু আদায় করেনি অথবা হজ্ব ফরয ছিল কিন্তু আদায় করেনি, সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আল্লাহ্ তাআলার কাছে বাসনা প্রকাশ করে বলবে ঃ আমি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই; অর্থাৎ, মৃত্যু আরও কিছু বিলম্বে আসুক, যাতে আমি সদকা-খয়রাত করে নেই এবং ফরয কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাই। وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ অর্থাৎ, কিছু অবকাশ পেলে এমন সৎকর্ম করে নেব, যদ্দ্বারা সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। যেসব ফরয বাদ পড়েছে, সেগুলো পূর্ণ করে নেব এবং যেসব হারাম ও মকরূহ কাজ করেছি, সেগুলো থেকে তওবা করে নেব। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা বলে দিয়েছেন যে, মৃত্যু আসার পর কাউকে অবকাশ দেয়া হয় না। সুতরাং এই বাসনা নিরর্থক।

সূরা আত্-তাগাবুন

خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ — অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন হয়ে গেছে। এখানে فَمِنْكُمْ এর فا অব্যয়টি এই অর্থ জ্ঞাপন করে যে, প্রথমে সৃষ্টি করার সময় কোন কাফের ছিল না। এই কাফের ও মুমিনের বিভেদ পরে সেই ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীনে হয়েছে, যা আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে দান করেছেন। এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার কারণেই মানুষের উপর গোনাহ্ ও সওয়াব আরোপিত হয়। এক হাদীসেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه—অর্থাৎ, প্রত্যেক সন্তান নির্মল স্বভাবধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে। (যার ফলে তার মুমিন হওয়া স্বাভাবিক ছিল।) কিন্তু এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রীষ্টান ইত্যাদিতে পরিণত করে।—(কুরতুবী)

وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ - তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে সুশ্রী করেছেন। আকৃতি তৈরী করা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বস্রষ্টার বিশেষ গুণ। এজন্যেই আল্লাহ্‌র নামসমূহের

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ
وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ٩ وَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ١٠ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ
يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ١١ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ
اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ١٢
اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ١٣ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ
وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ١٤ اِنَّمَآ
اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ١٥ فَاتَّقُوا
اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ۗ
وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ١٦ اِنْ
تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ
شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ١٧ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ١٨

(৯) সেদিন অর্থাৎ, সমাবেশের দিন আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এ দিন হার-জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্‌ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। যার তলদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে, তারা তথায় চিরকাল বসবাস করবে। এটাই মহাসাফল্য। (১০) আর যারা কাফের এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল এটা। (১১) আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (১২) তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রসূলুল্লাহ্‌র আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌঁছে দেয়া। (১৩) আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। অতএব মুমিনগণ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুক। (১৪) হে মুমিনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর, এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১৫) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। (১৬) অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্‌কে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (১৭) যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্‌ গুণগ্রাহী, সহনশীল। (১৮) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

মধ্যে مصور অর্থাৎ, আকৃতিদাতা বর্ণিত আছে। চিন্তা করুন, সৃষ্টজগতে কত বিভিন্ন জাতি রয়েছে, প্রত্যেক জাতিতে কত বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে লাখো বিভিন্ন ব্যক্তি রয়েছে। তাদের একজনের আকৃতি অপরজনের আকৃতির সাথে খাপ খায় না। একই মানব শ্রেণীর মধ্যে দেশ ও ভূখণ্ডের বিভিন্নতার কারণে এবং বংশ ও জাতির বিভিন্নতার কারণে আকৃতিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। তদুপরি তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির মুখাবয়ব অন্য সবার থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এই বিস্ময়কর কারিগরি ও ভাস্কর্য দেখে জ্ঞানবুদ্ধি দিশেহারা হয়ে পড়ে। মানুষের চেহারা ছয়-সাত বর্গ ইঞ্চির অধিক নয়। কোটি কোটি মানুষের একই ধরনের চেহারা সত্ত্বেও একজনের আকার অন্যজনের সাথে পুরোপুরি মিলে না যে, চেনা কঠিন হয়। আলোচ্য আয়াতে আকার নির্মাণের নেয়ামত উল্লেখ করার পর বলা হয়েছেঃ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ অর্থাৎ, তিনি মানবাকৃতিকে সমগ্র সৃষ্টজগত ও সৃষ্টজীবের আকৃতি অপেক্ষা অধিক সুন্দর ও সুষম করেছেন। কোন মানুষ তার দলের মধ্যে যতই কুৎসিত ও কদাকার হোক না কেন, অবশিষ্ট সকল জীবজন্তুর আকৃতির তুলনায় সে-ও সুশ্রী।

فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا — بشر শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনের অর্থ দেয়। তাই يهدون বহুবচন ক্রিয়াপদ তার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। মানবত্বকে নবুওয়ত ও রেসালতের পরিপন্থী মনে করাও কাফেরদের একটি অলীক ধারণা ছিল। কোরআনে স্থানে স্থানে এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, এখন মুসলমানদের মধ্যেও কেউ কেউ এমন দেখা যায়, যারা নবী করীম (সাঃ)-এর মানবত্ব অস্বীকার করে। তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা কোন্‌পথে অগ্রসর হচ্ছে? মানব হওয়া নবুওয়তেরও পরিপন্থী নয় এবং রেসালতের উচ্চমর্যাদারও প্রতিকূল নয়। রসূল (সাঃ) নূর হলেও মানব হতে পারেন। তিনি নূরও এবং মানবও। তাঁর নূরকে প্রদীপ, সূর্য ও চন্দ্রের নূরের নিরীখে বিচার করা ভুল।

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا — (বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি, যা আমি নাযিল করেছি।) এখানে নূর বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। কারণ, নূরের স্বরূপ এই যে, সে নিজেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল এবং অপরকেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল করে। কোরআন স্বকীয় অলৌকিকতার কারণে নিজে যে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কারণাদি, বিধি-বিধান, শরীয়ত এবং পরজগতের সঠিক তথ্যাবলী উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এগুলো জানা মানুষের জন্যে জরুরী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কেয়ামতকে লোকসানের দিন বলার কারণঃ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ যেদিন আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে একত্রিত করবেন একত্রিত করার দিবসে। এই দিনটি হবে লোকসানের। لِيَوْمِ الْجَمْعِ একত্রিত হওয়ার দিবস ও يَوْمُ التَّغَابُنِ লোকসানের দিবস—এই উভয়টি কেয়ামতের নাম। একত্রিত হওয়ার দিন একারণে যে, সেদিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জিন এবং মানবকে হিসাব-নিকাশের জন্যে একত্রিত করা হবে। পক্ষান্তরে تغابن শব্দটি غبن থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ লোকসান। আর্থিক লোকসান এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান উভয়কে غبن বলা হয়।

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল কোরআনে বলেন ঃ আর্থিক লোকসান জ্ঞাপন করার জন্যে এই শব্দটি صيغة مجهول এ ব্যবহৃত হয় এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান জ্ঞাপন করার জন্যে باب سمع থেকে ব্যবহৃত হয়। تغابن শব্দটি আভিধানিক দিক দিয়ে দুই তরফা কাজের জন্যে বলা হয়, অর্থাৎ, একজন অন্যজনের এবং অন্যজন তার লোকসান করবে, অথবা তার লোকসান প্রকাশ করবে।

বোখারীর এক রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তির কাছে কারও কোন পাওনা থাকে, তার উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করে অথবা মাফ করিয়ে নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। নতুবা কেয়ামতের দিন দিরহাম ও দীনার থাকবে না। কারও কোন দাবী থাকলে তা সে ব্যক্তির সৎকর্ম দিয়ে পরিশোধ করা হবে। সৎকর্ম শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারের গোনাহ্ প্রাপ্য পরিমাণে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।—(মাযহারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য তফসীরবিদ কেয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার উপরোক্ত কারণই বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকের মতে সেদিন কেবল কাফের, পাপাচারী ও হতভাগাই লোকসান অনুভব করবে না ; বরং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও এভাবে লোকসান অনুভব করবে যে, হায়! আমরা যদি আরও বেশী সৎকর্ম করতাম, তবে জান্নাতের সুউচ্চ মর্তবা লাভ করতাম। সেদিন প্রত্যেকেই জীবনের সেই সময়ের জন্যে পরিতাপ করবে, যা অযথা ব্যয় করেছে। হাদীসে আছে ঃ

من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه كان عليه حسرة يوم القيامة

যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে এবং সমগ্র মজলিসে আল্লাহ্‌কে স্মরণ না করে, কেয়ামতের দিন সেই মজলিস তার জন্য পরিতাপের কারণ হবে।

কুরতুবীতে আছে, প্রত্যেক মুমিনও সেদিন সৎকর্ম ত্রুটির কারণে স্বীয় লোকসান অনুভব করবে। সূরা মরিয়ম কেয়ামতের নাম يَوْمَ الْحَسْرَةِ পরিতাপ দিবস বলে বর্ণিত হয়েছে। তারই অনুরূপ এখানে লোকসান দিবস নাম রাখা হয়েছে।

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

— অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কারও উপর কোন বিপদ আসে না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ্ তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, আল্লাহ্ তাআলার অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোথাও সামান্যতম বস্তু নড়াচড়া করতে পারে না। আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কারও কোন ক্ষতি এবং উপকার করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তকদীরে বিশ্বাসী নয়, বিপদ মুহূর্তে তার জন্যে কোন স্থিরতা ও শান্তির উপকরণ থাকে না। সে বিপদ দূরীকরণের উদ্দেশে হা-হুতাশ ও ছটফট করতে থাকে। এর বিপরীতে তকদীরে বিশ্বাসী মুমিনের অন্তরকে আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাসী করে দেন যে, যা কিছু হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার অনুমতি ও ইচ্ছাক্রমে হয়েছে। যে বিপদ তাকে স্পর্শ করেছে, তা অবধারিত ছিল, কেউ একে টলাতে পারত না এবং যে বিপদ থেকে সে মুক্ত রয়েছে, তা থেকে মুক্ত থাকাই অবধারিত ছিল। তাকে এই বিপদে জড়িত থাকার সাধ্য কারও ছিল না। এই ঈমান ও বিশ্বাসের ফলে পরকালের সওয়াবের ওয়াদাও তার সামনে থাকে, যদ্দ্বারা দুনিয়ার বিপদও সহজ হয়ে যায়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

— অর্থাৎ, মুসলমানগণ, তোমাদের কতক স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু। তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা কর। তিরমিযী, হাকেম প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত সেই মুসলমানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হিজরতের পর মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে হিজরত করে চলে যেতে মনস্থ করে, কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজনরা তাদেরকে হিজরত করতে বাধা দেয়।—(রূহুল-মা'আনী)

وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ — পূর্ববর্তী আয়াতে যাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শত্রু আখ্যা দেয়া হয়েছে, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ভবিষ্যতে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে কঠোর ব্যবহার করার ইচ্ছা করল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের এই অংশে বলা হয়েছে ঃ যদিও এই স্ত্রী ও সন্তানরা তোমাদের জন্যে শত্রুর ন্যায় কাজ করেছে এবং তোমাদেরকে ফরয পালনে বাধা দিয়েছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের সাথে কঠোর ও নির্দয় ব্যবহার করো না ; বরং মার্জনা, উপেক্ষা ও ক্ষমার ব্যবহার কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার অভ্যাসও ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করা।

গোনাহ্‌গার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও বিদ্বেষ রাখা অনুচিত ঃ আলেমগণ আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে বলেছেন যে, পরিবার-পরিজনের কেউ কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ করে ফেললেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা ও তার জন্যে বদদোয়া করা উচিত নয়।—(রূহুল-মা'আনী)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ — فِتْنَةٌ শব্দের অর্থ পরীক্ষা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের পরীক্ষা নেন যে, এসবের মহব্বতে লিপ্ত হয়ে সে আল্লাহ্‌র বিধানাবলীকে উপেক্ষা করে, না মহব্বতকে যথাসীমায় রেখে স্বীয় কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়।

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ — অর্থাৎ, যথাসাধ্য তাকওয়া ও খোদাভীতি অবলম্বন কর। এর আগে কোরআন পাকে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌কে এমন ভয় কর, যেমন ভয় করা তাঁর প্রাপ্য। এই আয়াত সাহাবায়ে-কেরামের কাছে খুবই দুঃসাধ্য ও কঠিন মনে হয়। কারণ, আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অনুযায়ী আল্লাহ্‌কে ভয় করার সাধ্য কার আছে? এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে কোনকিছু করার আদেশ করেন না। কাজেই তাকওয়াও সাধ্যানুযায়ী ওয়াজিব বোঝতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাকওয়া অর্জনে কেউ তার পূর্ণ শক্তি ও চেষ্টা নিয়োজিত করলেই আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আদায় হয়ে যাবে।—(রূহুল-মা'আনী – সংক্ষেপিত)

سُورَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ○
يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّآ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ
أَمْرًا (١) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣)
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤) ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (٥)

সূরা আত্‌-ত্বালাক্ব

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) হে নবী, তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সীমালঙ্ঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ্ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দেবেন। (২) অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে, তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে। এতদ্দ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। (৩) এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (৪) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তানপ্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার কাজ সহজ করে দেন। (৫) এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন।

সূরা আত্‌-ত্বালাক্ব

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ — বাক্যের দাবী ছিল এই যে, এরপরেও একবচনে বিধান বর্ণনা করা হত। কিন্তু এখানে বহুবচন ব্যবহার করে إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ বলা হয়েছে। এতে প্রত্যক্ষভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু বহুবচনে সম্বোধন করার মধ্যে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আছে এবং এদিকে ইঙ্গিতও রয়েছে যে, এই বিধান বিশেষভাবে আপনার জন্যে নয়—সমগ্র উম্মতের জন্যে।

কেউ কেউ এস্থলে বাক্য উহ্য সাব্যস্ত করে এরূপ তফসীর করেছেন যে, হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন যে, তারা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়, তখন যেন পরে বর্ণিত আইন পালন করে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হয়েছে। অতঃপর তালাকের কতিপয় বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বিধান, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ — عدت এর শাব্দিক অর্থ গণনা করা। শরীয়তের পরিভাষায় সেই সময়কালকে ইদ্দত বলা হয়, যাতে স্ত্রী এক স্বামীর বিবাহ বের হওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাধীন থাকে। কোন স্বামীর বিবাহ থেকে বের হওয়ার উপায় দু'টি। (এক) স্বামীর ইন্তেকাল হয়ে গেলে। এই ইদ্দতকে "ইদ্দতে-ওফাত" বলা হয়। গর্ভবতী নয়—এমন মহিলাদের জন্যে এই ইদ্দত চার মাস দশদিন। (দুই) বিবাহ থেকে বের হওয়ার দ্বিতীয় উপায় তালাক। গর্ভবতী নয়—এমন মহিলাদের জন্যে তালাকের ইদ্দত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে পূর্ণ তিন হায়েয। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে তালাকের ইদ্দত তিন তোহ্‌র (পবিত্রতাকাল)। সারকথা, এর জন্যে কোন দিন ও মাস নির্ধারিত নেই; বরং যত মাসে তিন হায়েয অথবা তিন তোহর পূর্ণ হয়, তাই তালাকের ইদ্দত। যেসব নারীর বয়সের স্বল্পতা হেতু এখনও হায়েয হয় না অথবা বেশী বয়স হওয়ার কারণে হায়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের বিধান পরে আলাদাভাবে বর্ণিত হচ্ছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দতও পরে বর্ণিত হচ্ছে। এতে ওফাতের ইদ্দত ও তালাকের ইদ্দত একইরূপ। সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ আয়াতকে فطلقوهن لقبل عدتهن পাঠ করেছেন। হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে لقبل عدتهن ও এক রেওয়ায়েতে فى قبل عدتهن বর্ণিত আছে।—(রুহুল-মা'আনী)

বোখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) একথা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গোচরীভূত করলে তিনি খুব নারায হয়ে বললেন ঃ

ঃ তার উচিত হায়েয অবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করে নেয়া এবং স্ত্রীকে বিবাহে রেখে দেয়া। এই হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর আবার যখন স্ত্রীর হায়েয হবে এবং তা থেকে পবিত্র হবে, তখন যদি তালাক দিতেই চায়, তবে সহবাসের পূর্বে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে। এই ইদ্দতের আদেশই আল্লাহ্ তাআলা (আলোচ্য) আয়াতে দিয়েছেন।

এই হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয় — (এক) হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম। (দুই) কেউ এমতাবস্থায় তালাক দিলে সেই

তালাক প্রত্যাহার করে নেয়া ওয়াজিব (যদি প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হয়। ইবনে ওমর (রাঃ)–এর ঘটনায় তদ্রূপই ছিল।) (তিন) যে তোহ্‌রে তালাক দিবে, সেই তোহ্‌রে স্ত্রীর সাথে সহবাস না হওয়াই চাই। (চার) فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ আয়াতের তফসীর তাই।

উপরোক্ত কেরাতদ্বয় এবং হাদীসদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, কোন স্ত্রীকে তালাক দিতে হলে ইদ্দত শুরু হওয়ার পূর্বে তালাক দিতে হবে। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ)–এর মতে হায়েয থেকে, ইদ্দত শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে তোহ্‌রে তালাক দেয়ার ইচ্ছা থাকে সেই তোহ্‌রে সহবাস করবে না এবং তোহ্‌রের শেষ ভাগে হায়েয আসার পূর্বে তালাক দিবে। ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের মতে ইদ্দত তোহ্‌র থেকে শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোহ্‌রের শুরুতেই তালাক দিবে।

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে ঃ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ - احصاء শব্দের অর্থ গণনা করা। আয়াতের অর্থ এই যে, ইদ্দতের দিনগুলো সযত্নে স্মরণ রেখো এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই শেষ মনে করে নেয়ার মত ভুল করো না। ইদ্দতের দিনগুলো স্মরণে রাখার এই দায়িত্ব পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের। কিন্তু আয়াতে পুরুষবাচক পদ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, সাধারণভাবে সেসব বিধান পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে অভিন্ন, সেগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পুরুষবাচক পদই ব্যবহার করা হয়; স্ত্রীরা প্রসঙ্গতঃ তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই বিশেষক্ষেত্রে তফসীরের সার–সংক্ষেপে বর্ণিত বিশেষ রহস্যও থাকতে পারে যে, স্ত্রীরা অধিক আনমনা, তাই সরাসরি পুরুষদেরকেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় বিধান হচ্ছে ঃ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ অর্থাৎ, স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এখানে তাদের গৃহ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত তাদের বসবাসের হক পুরুষের দায়িত্বে থাকে, সেই পর্যন্ত গৃহে তাদের অধিকার আছে। তাতে তাদের বসবাস বহাল রাখা কোন কৃপা নয়; বরং প্রাপ্য আদায়। বসবাসের হকও স্ত্রীর অন্যতম হক। আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, এই হক কেবল তালাক দিলেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। বরং ইদ্দতের দিনগুলোতে এই গৃহে বসবাস করার অধিকার স্ত্রীর আছে। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জুলুম ও হারাম। এমনিভাবে স্ত্রীর স্বেচ্ছায় বের হয়ে যাওয়াও হারাম; যদিও স্বামী এর অনুমতি দেয়। কেননা, এই গৃহেই ইদ্দত অতিবাহিত করা স্বামীরই হক নয় আল্লাহ্‌রও হক, যা ইদ্দত পালনকারিণীর উপর ওয়াজিব। হানাফী মাযহাব তাই।

চতুর্থ বিধান হচ্ছে ঃ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ অর্থাৎ, ইদ্দত পালনকারিণী স্ত্রী কোন প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হারাম নয়। এটা তৃতীয় বিধানের ব্যতিক্রম। প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজ বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে।

(এক) নির্লজ্জ কাজ বলে খোদ গৃহ থেকে বের হয়ে যাওয়াই বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা দৃশ্যতঃ ব্যতিক্রম,যার উদ্দেশ্য গৃহ থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া নয়; বরং নিষেধাজ্ঞাকে আরও জোরদার করা। উদাহরণতঃ এরূপ বলা যে, এই কাজ করা কারও উচিত নয় সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে মনুষত্বই বিসর্জন দেয় অথবা তুমি তোমার জননীকে গালি দিও না এটা ব্যতীত যে, তুমি জননীর সম্পূর্ণই অবাধ্য হয়ে যাও। বলাবাহুল্য, প্রথম দৃষ্টান্তে ব্যতিক্রম দ্বারা সেই কাজের বৈধতা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য নয় এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে জননীর অবাধ্যতার বৈধতা প্রমাণ করা লক্ষ্য নয়; বরং বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তার আরও বেশী অবৈধতা ও মন্দ হওয়া বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতএব, আয়াতের বিষয়বস্তুর সার–সংক্ষেপ এই হল যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা তাদের স্বামীর গৃহ থেকে বের হবে না, কিন্তু যদি তারা অশ্লীলতায়ই মেতে উঠে ও বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এর অর্থ বের হয়ে যাওয়ার বৈধতা নয়; বরং আরও বেশী নিন্দা ও নিষিদ্ধতা প্রমাণ করা। নির্লজ্জ কাজের এই তফসীর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) সুদ্দী, ইবনে মায়েব, নাখয়ী (রহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) এই তফসীরই গ্রহণ করেছেন।— (রুহুল–মা'আনী)

(দুই) নির্লজ্জ কাজ বলে ব্যভিচার বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যতিক্রম যথার্থ অর্থেই বুঝতে হবে। অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ব্যভিচার করলে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তার প্রতি শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করার জন্যে অবশ্যই তাকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বের করা হবে। এই তফসীর হযরত কাতাদাহ্, হাসান বসরী, শা'বী যায়েদ ইবনে আসলাম, যাহ্হাক, ইকরিমা (রহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইউসুফ এই তফসীরই গ্রহণ করেছেন।

(তিন) নির্লজ্জ কাজ বলে কটু কথাবার্তা, ঝগড়া–বিবাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি তারা কটুভাষিণী ও ঝগড়াটে হয় এবং স্বামীর আপনজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তবে তাদেরকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা যাবে। এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। আলোচ্য আয়াতে হযরত উবাই ইবনে কা'ব ও আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)–এর কেরাত এরূপ ঃ الا ان يفحشن এই শব্দের বাহ্যিক অর্থ অশ্লীল কথাবার্তা বলা। এই কেরাত থেকেও সর্বশেষ তফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়।—(রুহুল–মা'আনী) এই অবস্থায়ও ব্যতিক্রম আক্ষরিক অর্থে থাকবে।

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

حُدُودُ اللَّهِ — لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا শরীয়তের নির্ধারিত আইনকানুন বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো লংঘন করে অর্থাৎ, আইন–কানুনের বিরোধিতা করে, সে নিজের উপর জুলুম করে; অর্থাৎ, আল্লাহ্ অথবা শরীয়তের কোন ক্ষতি করে না, নিজেরই ক্ষতিসাধন করে। এই ক্ষতি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়ই হতে পারে। পারলৌকিক ক্ষতি তো শরীয়ত বিরোধী কাজের গোনাহ্ ও পরকালের শাস্তি এবং ইহলৌকিক ক্ষতি এই যে, যে ব্যক্তি শরীয়তের নির্দেশাবলীর তোয়াক্কা না করে স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে অধিকাংশ সময় তিন তালাক পর্যন্ত পৌঁছে ক্ষান্ত হয়, যার পর পারস্পরিক প্রত্যাহার অথবা পুনর্বিবাহও হতে পারে না। মানুষ প্রায়ই তালাক দিয়ে অনুতাপ করে এবং বিপদের সম্মুখীন হয়; বিশেষ করে সন্তান–সন্ততি থাকলে। অতএব, তালাকের বিপদ দুনিয়াতেই তার ঘাড়ে চেপে বসে। অনেকেই স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার নিয়তে অন্যায়ভাবে তালাক দেয়। এরূপ তালাকের কষ্ট স্ত্রীও ভোগ করে। কিন্তু পুরুষের জন্যে এটা জুলুমের উপর জুলুম এবং দ্বিগুণ শাস্তির কারণ হয়ে যায়। (এক) আল্লাহ্‌র নির্ধারিত আইন–কানুন লংঘন করার শাস্তি এবং (দুই) স্ত্রীর উপর জুলুম করার শাস্তি।

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا — অর্থাৎ, তুমি জান না সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাআলা এই রাগ–গোস্বার পর অন্য কোন অবস্থা সৃষ্টি

করে দিবেন। অর্থাৎ, স্ত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত আরাম, সন্তানের লালন-পালন এবং গৃহের সহজ ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করে তুমি তাকে পুনরায় বিবাহে রাখার ইচ্ছা করতে পার। এমতাবস্থায় আবার বিবাহে থাকা তখন সম্ভবপর হবে, যখন তুমি তালাক দেয়ার সময় শরীয়তের আইন-কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং অহেতুক বাইন তালাক না দিয়ে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দাও। এরূপ তালাক দেয়ার পর প্রত্যাহার করে নিলে পূর্ববিবাহ যথারীতি বহাল থাকে। তুমি তিন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে তালাক দিও না, যার প্রত্যাহারের অধিকার থাকে না এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি সত্ত্বেও পরস্পরে পুনর্বিবাহও হালাল হয় না।

وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

— এখানে اجل শব্দের অর্থ ইদ্দত এবং اجل পর্যন্ত পৌঁছার অর্থ ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হওয়া।

তালাক সম্পর্কে পঞ্চম বিধান ঃ এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হয়, তখন স্থির মস্তিষ্কে পুনরায় চিন্তা করে দেখ যে, বিবাহ বহাল রাখা উত্তম না সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করে দেয়া ভাল। এ চিন্তার জন্যে এ সময়টি উত্তম। কারণ, ততদিনে পুরুষের সাময়িক রাগ-গোস্বা দমিত হয়ে যায়। যদি স্ত্রীকে বিবাহে রাখা স্থির হয়, তবে রেখে দাও। পরবর্তী আয়াতের ইঙ্গিত এবং হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী এর সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, মুখে বলে দাও আমি তালাক প্রত্যাহার করলাম। অতঃপর এর জন্যে দু'জন সাক্ষী রাখ।

পক্ষান্তরে যদি বিবাহ ভেঙ্গে দেয়াই সিদ্ধান্ত হয়, তবে স্ত্রীকে সুন্দর পন্থায় মুক্ত করে দাও। অর্থাৎ, ইদ্দত শেষ হতে দাও। ইদ্দত শেষ হয়ে গেলেই স্ত্রী মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যায়।

ষষ্ঠ বিধান ঃ ইদ্দত সমাপ্ত হলে স্ত্রীকে রাখার সিদ্ধান্ত হোক অথবা মুক্ত করে দেয়ার, উভয় অবস্থাতে কোরআন পাক তা মারূফ অর্থাৎ, যথোপযুক্ত পন্থায় সম্পন্ন করতে বলেছে। 'মারূফ' শব্দের অর্থ পরিচিত পন্থা। উদ্দেশ্য এই যে, যে পন্থা শরীয়ত ও সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত এবং মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে খ্যাত, সেই পন্থা অবলম্বন কর। তা এই যে, বিবাহে রাখা এবং তালাক প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত হলে স্ত্রীকে মুখে অথবা কাজে কর্মে কষ্ট দিও না, তার উপর অনুগ্রহ রেখো না এবং তার যে কর্মগত ও চরিত্রগত দুর্বলতা তালাকের কারণ হচ্ছিল, অতঃপর নিজেও তজ্জন্যে সবর করার সংকল্প কর, যাতে পুনরায় সেই তিক্ততা সৃষ্টি না হয়। পক্ষান্তরে মুক্ত করা সিদ্ধান্ত হলে তার বিদিত ও সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে অথবা গালমন্দ দিয়ে গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না; বরং সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় কর। কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, তাকে কোন বস্ত্রজোড়া দিয়ে বিদায় করা কমপক্ষে মোস্তাহাব এবং কোন কোন অবস্থায় ওয়াজিবও। ফেকাহ্‌র কিতাবাদিতে এর বিবরণ পাওয়া যাবে।

সপ্তম বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতে বিবাহে রাখা অথবা মুক্ত করে দেয়ার দ্বিবিধ ক্ষমতা দেয়া থাকে এবং পূর্ববর্তী لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا আয়াত থেকে প্রসঙ্গক্রমে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য হচ্ছে তালাক যদি দিতেই হয়, তবে এমন তালাক দিবে, যাতে প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে। এর সুন্নতসম্মত পন্থা এই যে, পরিষ্কার ভাষায় কেবল এক তালাক দিবে এবং সাথে সাথে রাগ-গোস্বা প্রকাশার্থে এমন কোন বাক্য বলবে না, যা বিবাহকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করার অর্থ জ্ঞাপন করে।

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ — অর্থাৎ, মুসলমানদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী করে নাও এবং তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সঠিক সাক্ষ্য কায়েম কর।

অষ্টম বিধান ঃ এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার সময় প্রত্যাহার করা সিদ্ধান্ত হোক কিংবা মুক্ত করা, উভয় অবস্থাতে এই কাজের জন্যে দু'জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রাখতে হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে এই বিধানটি মোস্তাহাব, এর উপর প্রত্যাহার নির্ভরশীল নয়। প্রত্যাহারের অবস্থায় সাক্ষী করার তাৎপর্য এই যে, পরবর্তীকালে স্ত্রী যাতে প্রত্যাহার অস্বীকার করে বিবাহ চূড়ান্তরূপে ভঙ্গ হওয়ার দাবী না করে বসে। মুক্ত করার অবস্থায় এ জন্যে সাক্ষী করতে হবে, যাতে পরবর্তীকালে স্বয়ং স্বামীই দুষ্টুমিচ্ছলে অথবা স্ত্রীর ভালবাসায় পরাভূত হয়ে দাবী না করে বসে যে, সে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই প্রত্যাহার করেছিল। সাক্ষীদ্বয়ের জন্যে ذَوَيْ عَدْلٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, শরীয়তের পরিভাষা অনুযায়ী সাক্ষীদ্বয়ের নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরী। অন্যথায় তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী কোন বিচারক ফয়সালা দিবে না।

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ বাক্যে সাধারণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা কোন প্রত্যাহার কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনায় সাক্ষী হও এবং বিচারকের এজলাসে সাক্ষ্য দেয়ার প্রয়োজন হয় তবে কারও মুখ চেয়ে অথবা বিরোধিতা ও শত্রুতার কারণে সত্য সাক্ষ্য দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয়ো না।

ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ — অর্থাৎ, উপরোক্ত বিষয়বস্তু দ্বারা সে ব্যক্তিকে উপদেশ দান করা হচ্ছে, যে আল্লাহ্ ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এতে বিশেষভাবে পরকালে উল্লেখ করার কারণ এই যে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার আদায় খোদাভীতি ও পরকাল চিন্তা ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

— অর্থাৎ, যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্যে প্রত্যেক সংকট ও বিপদ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত রিযিক দান করেন।

تَقْوَىٰ শব্দের আসল অর্থ আত্মরক্ষা করা। শরীয়তের পরিভাষায় গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করার অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত হলে এর অনুবাদ করা হয় আল্লাহ্‌কে ভয় করা। উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ও গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা ও ভয় করা।

আলোচ্য আয়াতে تَقْوَىٰ তথা খোদাভীতির দু'টি কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে — (এক) খোদাভীতি অবলম্বনকারীর জন্যে আল্লাহ্ তাআলা নিষ্কৃতির পথ করে দেন। কি থেকে নিষ্কৃতি? এ সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, দুনিয়ার যাবতীয় সংকট ও বিপদ থেকে এবং পরকালের সব বিপদাপদ থেকে নিষ্কৃতি। (দুই) তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন, যা কল্পনায়ও থাকে না। এখানে রিযিকের অর্থও ইহকাল এবং পরকালের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু। এই আয়াতে মুমিন-মুত্তাকীর জন্যে আল্লাহ্ তাআলার এই ওয়াদা ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি তার প্রত্যেক সমস্যাও সহজসাধ্য করেন এবং তার অভাব-অনটন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে এমন পথে তার প্রয়োজনাদি সরবরাহ করেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না।—(রূহুল-মা'আনী)

স্থানের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে কোন কোন তফসীরবিদ এই

আয়াতের তফসীরে বলেছেন ঃ তালাকদাতা স্বামী ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী উভয়ই অথবা তাদের মধ্যে যে কেউ খোদাভীতি অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তী সকল সংকট ও কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দান করবেন। পুরুষকে তার যোগ্যা স্ত্রী এবং স্ত্রীকে তার উপযুক্ত স্বামী দান করবেন। বলাবাহুল্য, আয়াতের যে আসল অর্থ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই অর্থও তাতে শামিল আছে।—(রূহুল-মা'আনী)

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, আল্লাহ্ তার মুশকিল কাজের জন্যে যথেষ্ট। কেননা, আল্লাহ্ তার কাজ যেভাবে ইচ্ছা পূর্ণ করে ছাড়েন। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। তদনুযায়ী সব কাজ সম্পন্ন হয়। তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হযরত ওমর (রাঃ) – এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدواخماصا وتروح بطانا

যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর যথাযথ ভরসা করতে, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে পশু-পক্ষীর ন্যায় রিযিক দান করতেন। পশু-পক্ষী সকাল বেলায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) –এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক বিনাহিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের অন্যতম গুণ এই যে, তারা আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে। — (মাযহারী)

وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ ..... اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ এই আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের ইদ্দতের আরও বিবরণ আছে। এতে ইদ্দতের সাধারণ বিধি থেকে ভিন্ন তিন প্রকার স্ত্রীদের ইদ্দতের বিধান বর্ণিত হয়েছে।

তালাকের ইদ্দত সম্পর্কিত নবম বিধান ঃ সাধারণ অবস্থায় তালাকের ইদ্দত পূর্ণ তিন হায়েয। কিন্তু যেসব মহিলার বয়োঃবৃদ্ধি অথবা কোন রোগ ইত্যাদির কারণে হায়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে, এমনিভাবে যেসব মহিলার বয়স না হওয়ার কারণে এখনও হায়েয আসা শুরু হয়নি তাদের ইদ্দত আলোচ্য আয়াতে তিন হায়েযের পরিবর্তে তিন মাস নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দত সন্তানপ্রসব সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা যতদিনেই হোক।

اِنِ ارْتَبْتُمْ – অর্থাৎ, যদি তোমাদের সন্দেহ হয়। সাধারণ ইদ্দত হায়েয দ্বারা গণনা করা হয়, কিন্তু এসব মহিলার হায়েয বন্ধ ; অতএব, তাদের ইদ্দত কিভাবে গণনা করা হবে—এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাকেই আয়াতে সন্দেহ বলা হয়েছে।

অতঃপর আবার খোদাভীতির ফযীলত ও বরকত বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا অর্থাৎ, যে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার কাজ সহজ করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া ও পরকালের কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এরপর আবার তালাক ও ইদ্দতের বর্ণিত বিধানাবলী পালন করার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ — এটা আল্লাহ্র বিধান, যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। এরপর তাকওয়ার আরও একটি ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছেঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا — অর্থাৎ, যে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পাপসমূহ মোচন করেন এবং তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেন।